"নবীনভারত" গ্রন্থাবলী নং ১

মহাত্মা গান্ধী
ও
তাঁহার মত

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত

কলিকাতা
৬৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩২৮

মূল্য আট আনা

M. K. Gandhi

মহাত্মা গান্ধী

ও
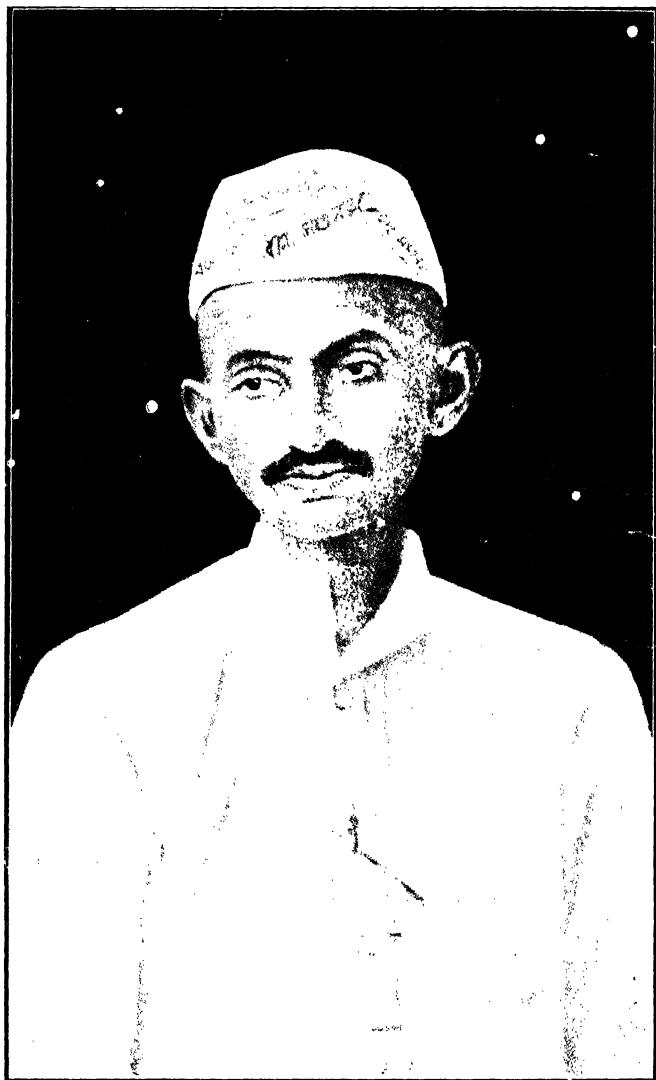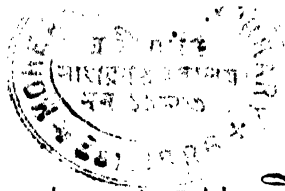
তাঁহার মত

(১)

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি সাগর-মধ্যস্থিত দ্বারকা হইতে ষাট মাইল দূরে—আরব সাগরের তীরে পোর-বন্দরনামে একটী ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য আছে। ষাট খানা মাত্র গ্রাম লইয়া এই রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত। রাজার উপাধি রাণা। রাজ্যটী ইংরেজদের করদ।

বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এই পোর-বন্দর নগরের এক সম্ভ্রান্ত বণিকের গৃহে এক জৈন ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, সম্মুখে এক অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক ও তাহার মাতা দণ্ডায়মানা।

মাতা সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"প্রতিজ্ঞা কর বাবা, বিলাত যাইয়া মদ্যপান করিবে না, মাংস খাইবে না, স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশা করিবে না।"

পুত্র একে একে তিনবার—সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে মায়ের শপথ গ্রহণ করিলেন। সন্তানের ত্রি-সত্য শুনিয়া মায়ের মুখ হইতে উদ্বেগের আঁধার কাটিয়া গেল।

যে দেশগত-প্রাণ মহাত্মার স্বার্থত্যাগ, পরোপকারিতা ও সত্যাশ্রয় আজ জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—উপরি বর্ণিত সেই যুবকই আমাদের জগন্মান্য **মহাত্মা গান্ধী**।

পোর-বন্দরের গান্ধী বংশ অতিশয় সম্মানিত। প্রভুপরায়ণতা, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার জন্য এই গান্ধী বংশ দেশপ্রসিদ্ধ। এই বংশের—উত্তমচাঁদ গান্ধী পোর-বন্দরের রাণার দেওয়ান ছিলেন। বৃদ্ধ রাণার মরণের পর পুত্র ভিক্রমৎজী রাণা হন। কিন্তু তিনি শিশু বলিয়া রাণীর উপর কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত হয়।

রাণীর সহিত মতের মিল না হওয়াতে স্বাধীন-প্রকৃতি দেওয়ান উত্তমচাঁদ রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া—নিকটবর্ত্তী জুনাগড়নামক রাজ্যে চলিয়া যান। জুনাগড়ের নবাব সাহেব বিশেষ আদরের সহিত এই বৃদ্ধ দেওয়ানকে আশ্রয় দান করেন।

জুনাগড়ে আশ্রয় লইবার সময় উত্তমচাঁদ যে নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন—বর্ত্তমান কালে তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে কি না সন্দেহ। ব্যাপারটা এই ;—উত্তমচাঁদ জুনাগড় নবাব দরবারে উপস্থিত হইয়া আশ্রয়দাতা নবাবকে বামহস্তে অভিবাদন করিয়াছিলেন। সভাস্থ আমীর ওমরাহগণ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, উত্তমচাঁদ সবিনয়ে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—"পোরবন্দরে বহু দুঃখ পাইয়াছি—সে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছি—তাহারা আমার প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছে সত্য, তবু কিন্তু আমার এই দক্ষিণ হস্ত সেই মাতৃভূমি পোর-বন্দরের সেবার জন্যই রাখিয়াছি।"

মহাপ্রাণ নবাব আশ্রয়প্রার্থীর এ হেন অকপটতা, নির্ভীকতা ও স্বদেশ-প্রীতিতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অতিশয় সম্মানের সহিত এই স্বদেশভক্ত দেওয়ানকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু উত্তমচাঁদের এ অবস্থা বেশী দিন রহিল না।

কিছুকাল যাইতে না যাইতেই পোরবন্দর রাজ্য হইতে দেওয়ান উত্তমচাঁদের ডাক পড়িল। স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মা অবিলম্বে মাতৃভূমিতে ফিরিয়া গেলেন—পূর্ব্বের ন্যায় দেওয়ানের কাজ করিতে লাগিলেন।

উত্তমচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র করমচাঁদ দেওয়ান হইলেন। ইনিই আমাদের মহাত্মা গান্ধীর জনক। তিনিও পোর-বন্দরের দেওয়ান পদে পঁচিশ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। শেষে রাণার সহিত মতের অমিল হওয়াতে রাজকোট নামক রাজ্যের দেওয়ানী গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পোর-বন্দরের দেওয়ানীভার প্রদান করিয়া যান।

ধর্ম্মপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, নিস্পৃহতা এবং তেজস্বিতা করমচাঁদের চরিত্রের ভূষণ ছিল। এই সকল গুণে অতিশয় প্রীত হইয়া রাজকোটের ঠাকুর সাহেব দেওয়ানকে একটা বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করিতে চাহেন। দেওয়ান কিন্তু কোন মতেই উহা গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই, শেষে অনেক উপরোধ অনুরোধের পর উহার সামান্য অংশমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ নির্লোভ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আজ কাল বড়ই বিরল।

রাজকোটের ঠাকুর সাহেব নামে মাত্র রাজা। প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ প্রতিনিধি—পলিটিক্যাল এজেণ্টই সেখানকার রাজা। যে সময়ে করমচাঁদ দেওয়ান, তখন এক দিন সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট দেওয়ানের সম্মুখেই ঠাকুর সাহেব সম্বন্ধে কতকগুলি অন্যায় কথা বলেন। রাজভক্ত দেওয়ান তৎক্ষণাৎ সেই উক্তির প্রতিবাদ করেন।

ক্ষমতাগর্ব্বী এজেণ্ট সাহেবের ইহা সহিল না, তিনি রাগে রক্তবদন হইয়া দেওয়ানকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য হুকুম করিলেন। দেওয়ান যে কি প্রকৃতির মানুষ—সাহেব তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। সুতরাং করমচাঁদ এইরূপ অন্যায় ও অকারণ আদেশ পালিতে রাজী হইলেন না দেখিয়া সাহেবের রাগ আরো বাড়িয়া গেল। সুতরাং তিনি দেওয়ানকে বন্দী করিয়া একটা গাছের নীচে কয়েক ঘণ্টা বসাইয়া রাখিলেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণ করমচাঁদ, বিনা আপত্তিতে, অবিচলিতভাবে বন্দী অবস্থায় রহিলেন। রাজার প্রতি অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করা যেমন তিনি

কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন, আবার এজেণ্ট সাহেবের বলপ্রয়োগে বাধাপ্রদান না করাও তিনি তেমনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারটা যখন নগরবাসীদিগের কাণে গেল—তখন নাগরিকেরা বিশেষ চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা বড় সুবিধার নহে বুঝিয়া এজেণ্ট সাহেব—দেওয়ানের সহিত আপোস মীমাংসা করিলেন—ক্ষমা চাওয়ার কথা আর তুলিলেন না।

গান্ধী বংশ বৈষ্ণব। বংশের ধর্ম্ম এবং দেশের আচার ব্যবহার প্রতি-পালনে করমচাঁদের অতিশয় নিষ্ঠা ছিল। ভগবদ্গীতা খানা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোনরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে তিনি লিপ্ত হইতেন না।

দেওয়ান করমচাঁদের পত্নী—গান্ধীর জননীও ধর্ম্মপ্রবণতা, দরিদ্র-সেবা, বুদ্ধি, তেজস্বিতা ও চিত্তের দৃঢ়তায় অদ্বিতীয় ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, রাজ-দরবারের রমণীগণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ও জানা শুনা ছিল।

এইরূপ বংশে, এইরূপ মাতা পিতার গৃহে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শনিবার মহাত্মা গান্ধী ভূমিষ্ঠ হন। গান্ধীর প্রকৃত নাম **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী**। ইনি মাতা-পিতার কনিষ্ঠ সন্তান।

শৈশবে সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি পোর-বন্দরের একটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন। শেষে পিতার সহিত রাজকোটে চলিয়া যান। এখানেই প্রায় তাঁহাদের স্থায়ী বাড়ী হয়। কেবল বিশেষ কাজকর্ম্ম উপলক্ষেই তাঁহারা পোর-বন্দরের বাড়ীতে যাইতেন।

রাজকোটে আসিয়া গান্ধী প্রথমে একটী দেশী বিদ্যালয়ে কিছুকাল মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। দশবৎসর বয়সে তিনি কাথিয়াবর উচ্চ-

ইংরেজীস্কুলে ভর্ত্তি হন। সাতবৎসরকাল এই স্কুলে পড়ার পর তিনি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কাথিয়াবর স্কুলে পড়িবার সময়—গান্ধীর বিবাহ হয়। বিবাহ সময়ে মহাত্মার বয়স ছিল মাত্র বার বছর। তাঁহার আট বছর বয়সের সময়েই এই বালিকাটীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয়। বিবাহের কিছুদিন আগে বালিকাকে রাজকোটে আনা হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি জীবনের সম-সুখদুঃখভাগিনীকে খেলার সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিলেন। শৈশবে বিবাহিতা হইলেও ইনি সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা প্রমাণিত করিয়াছেন। পোরবন্দরের পৈতৃকগৃহেই বিশেষ সমারোহে বালকবালিকার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

গান্ধীবংশ বৈষ্ণব—নিরামিষ-ভোজী। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে—দেশীয় আচার ব্যবহার—খাদ্য-খাদকতা বিষয়ে কিশোরবয়স্ক গান্ধীর মনে ধীরে ধীরে কতকগুলি সন্দেহ জন্মিতেছিল। সমপাঠীদিগের সহিত আলোচনা আন্দোলনের ফলে ক্রমে সন্দেহগুলি সত্য বলিয়া মনে হইল—তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক শাসন সকল ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে মাংস ভোজনই প্রথম ও প্রধান কাজ।

মাংস না খাইলে বিশ্ববিজয়ী ইংরেজের মত বলবান্ ও স্বাধীন হওয়া যায় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া—আরো কয়েকজন সহপাঠীর সহিত স্কুল ছুটির পর গান্ধী নদীরকূলে যাইয়া গোপনে মাংস রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন।

মাবাপের আদর্শে ও শিক্ষায় বালক গান্ধী সত্য বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই মাংস খাওয়া উপলক্ষে সেই সত্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। কেননা স্কুলের ছুটির পর সন্ধ্যাকালে গুরুপাক মাংস খাইয়া তিনি বাড়ীতে রাত্রে আর খাইতে পারিতেন না। কাজেই নানা ছলনাবাক্যে—ক্ষুধা নাই বলিয়া অব্যাহতি পাইতে হইত।

শৈশব হইতে সত্যকথনে অভ্যস্ত বালক, এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইত। বিশেষতঃ ধৰ্ম্মপ্রাণা জননী যদি ঘুণাক্ষরেও এই মাংস খাওয়ার ব্যাপার জানিতে পারেন—তাহা হইলে স্নেহময়ী মৰ্ম্মবেদনায় যে কিরূপ আকুল হইবেন, সে কথা ভাবিয়া গান্ধী বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। পরিশেষে সত্যেরই জয় হইল—গান্ধী মাংস খাওয়া ত্যাগ করিলেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি আর মাংস স্পর্শ করেন নাই।

মাতা-পিতা ও পিতামহের মনের উজ্জ্বল বৃত্তিগুলি গান্ধীর জীবনে ধীরে ধীরে বিকাশ পাইয়াছে এবং তাহারই ফলে গান্ধী আজ ভারতের—তথা পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লোক। কোটী কোটী লোক তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর।

কাথিয়াবর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গান্ধী ভাও-নগর কলেজে পড়িতে গেলেন। একবৎসর পর কলেজের ছুটিতে রাজকোট ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ বন্ধু তাহাকে ব্যারিষ্টারী পড়িবার পরামর্শ দেন। বন্ধুর কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করিয়া গান্ধী বিলাতে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বিলাত যাইবার অনেক পূৰ্ব্বেই তাঁহার পিতা ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে বিলাত যাইতে মত দিলেও মা কোনমতেই তাহাতে রাজী হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুর ছেলে বিলাতে গেলেই অখাদ্য খায়, ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম বর্জ্জিত অহিন্দু হয়। মোহনদাস মাতার মন হইতে সমুদয় সন্দেহ ও ধারণা দূর করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে জৈন সন্ন্যাসীর সম্মুখে মায়ের কাছে তিনবার শপথ করিয়া তিনি বিলাত যাইবার অনুমতি পাইলেন। সেই শপথের বৃত্তান্ত পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(২)

মায়ের কাছে অনুমতি পাইয়া মোহনদাস বিলাত যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা দীর্ঘকাল পোরবন্দর এবং রাজকোটের দেওয়ানী করিলেও অর্থ সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কেননা তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাই নানা প্রকারে দান করিতেন। বিলাতে পড়িতে হইলে প্রচুর অর্থের আবশ্যক, সুতরাং গান্ধী অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজকোট হইতে পোরবন্দরে আসিলেন।

গান্ধীর পিতৃব্য এই সময়ে পোরবন্দরের দেওয়ান। তিনি তাঁহার কাছেও বিলাতে যাইবার জন্য অনুমতি লইলেন। এদিকে পোরবন্দর রাজসরকার হইতে একটা বৃত্তি পাইবার জন্যও নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিলাত যাইবার অনুমতি পাইবার জন্য গান্ধী মায়ের কাছে যে শপথ করিয়াছিলেন, পোরবন্দরের এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর স্যার এফ্. এস্. পি. লেলির কাছে সে কথা পৌঁছিয়াছিল। তিনি ঐ শপথকে পছন্দ করিলেন না, সুতরাং গান্ধীকে তিনি রাজসরকার হইতে কোন বৃত্তি দিলেন না। এদিকে আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে অনেকেও তাঁহার বিলাত যাওয়ার বিরোধী হইলেন। গান্ধী সে সকল বাধা গ্রাহ্য না করিয়া প্রত্যক্ষদেবী জননীর পায়ের ধূলি মাথায় ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অপর দুইটী ভারতীয় যুবকের সহিত গান্ধী বিলাতের রাজধানী লণ্ডনে পৌঁছিলেন। তিন বন্ধু ভিক্টোরিয়া হোটেলে বাসা লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

লণ্ডন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নগর বলিয়া কথিত। কেবল আয়তনে নহে— ঐশ্বর্য্যে, স্বাধীনতায়, কর্ম্মপ্রবণতায় এবং উদ্দাম বিলাসিতার বিপুল উচ্ছ্বাসেও

সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভিন্নদেশের তরুণ-বয়স্ক যুবকগণ এখানে আসিয়া প্রায়শঃ সেই উদ্দাম বিলাসিতার স্রোতে গা-ভাসাইতে বাধ্য হয়—তাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। যুবক গান্ধীও সেই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ইংরেজী আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দায়, বেশভূষা, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে নিখুঁত সাহেব হইয়া উঠিলেন। এবিষয়ে কয়েকজন ভারতীয় যুবক—যাঁহারা গান্ধীর অনেক আগে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন—তাঁহারাই শিক্ষাদাতা ও সহায় হইলেন।

সংসর্গের প্রভাবে গান্ধী বিলাসিতার স্রোতে ভাসিলেন বটে, কিন্তু বিলাত যাত্রার কালে মায়ের কাছে যে শপথ করিয়াছিলেন তাহার অন্যথা করিলেন না। এজন্য তাঁহার জনৈক ভারতীয় বন্ধু গান্ধীকে প্রায়ই গালাগালি করিতেন। গান্ধী কিন্তু বন্ধুর তিরস্কার সহিয়া লইতে লাগিলেন, তবু শপথ ভাঙ্গিলেন না। বন্ধুরা নানা ফাঁদে ফেলিয়া গান্ধীর শপথ ভাঙ্গিবার জন্য ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন।

কয়েকজন সহাধ্যায়ী একদিন একটা ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। হল্‌বরণ রেষ্টোরেন্সে উহার আয়োজন হইল। ভোজের সঙ্গে নাচগানের ব্যবস্থাও ছিল। গান্ধী যথাকালে সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন।

বিলাতী কায়দা অনুসারে আহারে বসিয়া খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। গান্ধীও সেই ভদ্রতা রক্ষা করিতে বাধ্য, এই মনে করিয়া ভোজের উদ্যোগী বন্ধুটী গান্ধীকে মদ্যমাংস খাওয়াইবার কল্পনা করিলেন। নিজের চিত্তদিয়াই বন্ধুটী গান্ধীর চিত্তের বিচার করিয়া লইলেন!

যথাকালে সকলে ভোজের টেবিলে বসিয়া গেলেন। সহাধ্যায়ী বন্ধুটী কাছাকাছিই বসিলেন। পরিচারক খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিতেই গান্ধী

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, "ঝোল কি মাংসের?" বন্ধুটী বিলাতী কায়দা ষোল আনা বজায় রাখিয়া অন্যকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করার মত গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি পরিবেষণকারীকে একথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? গান্ধী স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি মাংস স্পর্শ করেন না, তাই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভোজদাতা বন্ধুর ইহাতে বড় রাগ হইল, অসামাজিকতার জন্য তিনি গান্ধীকে ভর্ৎসনা করিলেন। আবাল্য সত্যের সেবক, প্রতিজ্ঞাপালক গান্ধী তৎক্ষণাৎ টেবিল ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন, তাদৃশ ভদ্রতা ও সামাজিকতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার বিলাতী-মোহ কাটিয়া গেল, সমুদয় বিলাস-বিভ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি পড়ায় মন দিলেন।

বিলাসী বন্ধুদলের সঙ্গ তাঁহার কাছে আর মোটেই ভাল লাগিল না। সুতরাং তিনি একটা আলাদা ঘর ভাড়া লইলেন, স্বয়ং পাক করিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ফলে, পড়াশুনায় ত তিনি অধিক সময় ব্যয় করিতে পারিলেনই অধিকন্তু তাঁহার খরচের মাত্রাও কমিয়া গেল। এই স্বাবলম্বন ও স্বদেশিকতার ফলে মাসে ষাট টাকার বেশি তাঁহার খরচ লাগিত না। এইভাবে তিনি তিন বছর কাল বিলাতে কাটাইলেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি লণ্ডন ইউনিভারসিটির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন।

বিলাসিতা ও উদ্দামস্বাধীনতার ফলেই যে ভিন্ন-দেশীয় ছাত্রগণ শুধু মুগ্ধ হইয়া পড়ে তাহা নহে। তাহারা অনেক সময়ে ঐ সকল মোহের বশে পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়—অন্ততঃ পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তো হয়ই। গান্ধীর উপরও তেমন একটা ঝড় আসিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয়

ব্রহ্মচারীর কাছে সেই ঝড়ের প্রভাব পরাস্ত হইয়া গিয়াছিল। গান্ধীকে খৃষ্টান করিবার জন্য কোন কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই, থিওসফী সম্প্রদায়ের ব্লাভাট্স্কির রচিত পুস্তকাদি পড়িয়াও তিনি তন্মতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। বরং ঐ সকল দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে একটা অজ্ঞানতার ও সন্দেহের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে তিনি গীতার পাঠক হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের সকল সন্দেহ সকল অন্ধকার কাটিয়া গেল। জীবনের গতি-পথ উজ্জ্বল আলোকে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল। গীতার অমূল্য—অতুল্য উপদেশই তাঁহার একমাত্র উপদেষ্টা ও আশ্রয় হইল।

তিনবছর বিলাত বাসের পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। জাহাজ হইতে বোম্বাই-বন্দরে নামিয়াই গান্ধী শুনিতে পাইলেন, তাঁহার প্রত্যক্ষ দেবী স্নেহময়ী জননী দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ নিদারুণ সংবাদ তাঁহার হৃদয়ে বজ্রের মত আপতিত হইল। হায়! তিনি যে ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী বীরের মত বিলাসিতার সকল প্রলোভন পদদলিত করিয়া মায়ের আদেশ—নিজের শপথ রক্ষা করিয়া কত আশা লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন! যাঁহার পুণ্যস্মৃতি তাঁহাকে অধঃপতনের সকল প্রকার পথ হইতে রক্ষা করিয়াছে—সেই স্নেহমমতার আধার—পুণ্যের অনন্তপ্রস্রবণ মাকে আর দেখিতে পাইবেন না! এই ভাবনায় গান্ধী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

পড়াশুনায় ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া আত্মীয়স্বজনগণ মাতৃভক্ত গান্ধীকে এতদিন এই শোকের সংবাদ প্রদান করেন নাই। যাহা হউক, গান্ধীর দাদা পূর্ব্বেই সকল আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে বোম্বাই হইতে গান্ধীকে রাজকোটে না পাঠাইয়া নাসিকে পাঠাইলেন। নাসিক যাইয়া গান্ধী পুণ্যসলিলে স্নান-তর্পণাদি এবং যাবতীয়

আত্মীয়-স্বজনাদির সহিত একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া শুদ্ধ হইলেন।

অতঃপর তিনি রাজকোটের আবাসগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন, আবশ্যক হইলে রাজকোটের বিচারালয়েও মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এতদিন তিনি কেবল ইংরাজী পড়াশুনায়ই ব্যস্ত ছিলেন, নিজের ধর্ম্মের কোন আলোচনা বা শিক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। হাইকোর্টে কাজ আরম্ভ করার পর ধর্ম্মালোচনার দিকে তাঁহার চেষ্টা হইল। তিনি একজন জৈন পণ্ডিত রাখিয়া স্বধর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দেড় বছর কাটিয়া গেল। এসময়ে মহাত্মা গান্ধীর বয়স প্রায় পঁচিশ বছর। একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে এই সময়ে তাঁহার জীবনের গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইল।

গান্ধীর ভ্রাতার সহিত পোর-বন্দরের বহু স্বজাতীয় বণিকের জানাশুনা ছিল। এই সকল বণিকের মধ্যে অনেকে নানাস্থানে ব্যবসায় করিতেন। তাঁহাদেরই একজন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইংরেজের উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া নগরে একটা কুঠী স্থাপন করিয়া ব্যবসা করিতেছিলেন। আরও অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীও তথায় বাণিজ্য উপলক্ষে কুঠী করিয়াছিলেন।

এই বণিকগণ সেখানে একটা বড় জটিল মোকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন। মোকদ্দমা যেরূপ জটিল তাহাতে উহার নিষ্পত্তি হইতে অন্ততঃ এক বছর লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হয়। পোর-বন্দরের ঐ বণিকটী এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর জ্যেষ্ঠকে ধরিয়াছিলেন। তিনিই গান্ধীর উপর ঐ ভার দেন। গান্ধী এই নূতন কার্য্যের ভার লইয়া ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করেন।

(৩)

আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব্বদক্ষিণাংশে ইংরেজ, জর্ম্মণী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজগণ কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইংরেজের উপনিবেশ কেপ-কলোনি ও নেটাল, ওলন্দাজ জাতীয় বুয়রগণের উপনিবেশ অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট ও ট্রান্স-ভাল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কাফ্রী অর্থাৎ আফ্রিকাবাসীদিগের কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্যও আছে।

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ উপনিবেশ নেটালে ভারতবর্ষ হইতে বহু শ্রমজীবী লইয়া যাওয়া হয়। কারণ নেটাল, কেপ-কলোনি প্রভৃতি স্থানগুলি তখন বড়ই অনুর্ব্বর ছিল, আর সে দেশে লোকজনের বসতি খুবই কম ছিল, কাজেই কৃষিকার্য্যাদি করিবার জন্য শ্রমিক পাওয়া যাইত না।

ভারতীয় শ্রমিকেরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে পাঁচ বৎসরের জন্য ঐ সকল দেশে যাইত। নির্দ্দিষ্ট কাল চলিয়া গেলে কেহ কেহ দেশে ফিরিয়া আসিত, আবার বহুলোক সেই দেশেই নানাপ্রকার কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত—কেহই পুনরায় চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে চাহিত না। কারণ এই নিরক্ষর শ্রমিকদলের অমানুষ চেষ্টায় যদিও ভূমির মালিকেরা প্রচুর অর্থ উপায় করিতেন, তথাপি তাঁহারা ইহাদের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করিতেন না। ঐ অসদ্ব্যবহারে তিক্ত ও ত্যক্ত হইয়াই শ্রমিকেরা পুনরায় আর চুক্তির ফাঁদে আটকা পড়িতে চাহিত না।

এইরূপে শ্রমিকদল সে দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিলে ভারতবর্ষের কতকগুলি ব্যবসায়ীও সেখানে যাইয়া এই সকল শ্রমিকের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা উপলক্ষে দোকান খুলিয়াছিলেন। ক্রমে ইঁহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল বসিল, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার গেল,

ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য পুরোহিতের প্রতিষ্ঠা হইল, কাজকর্ম্মের জন্য কেরাণী ও দো-ভাষীর আবশ্যক হইল! দেখিতে দেখিতে ১৫।২০ বছরের মধ্যে এক নেটালেই প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার ভারতবাসীর বাস হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে কেপ-কলোনিতেও প্রায় দশ হাজার এবং ট্রান্স-ভালে পাঁচ হাজার ভারতবাসী বাস করিত। সুতরাং সমাজ-সামাজিকতার ন্যায় স্বার্থ অস্বার্থ লইয়া সে দেশের আদালতে তাহাদের মামলা মোকদ্দমাও চলিতেছিল।

এইরূপ একটা মামলার জন্য—জনৈক ভারতীয় সওদাগর গান্ধীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কেবল যে শ্রমিকদলের উপরই উপনিবেশের ইংরেজেরা জোরজুলুম বা অবৈধ অত্যাচার করিত তাহা নহে, বিচারক্ষেত্রেও তাহারা সুবিচার পাইত না। তাই দেশ হইতে তাহারা ব্যারিষ্টার লইয়া যাইয়া মামলা চালাইবার ব্যবস্থা করিল।

গান্ধী নেটালে চলিলেন। জাহাজ যখন ভারতসমুদ্রের বক্ষে নেটালের কূল বাহিয়া চলিল, তখন সে স্থানের বিপুল বিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্র, খর্জ্জুর বাগান ও কদলীবন দেখিয়া বারংবার শস্য-শ্যামলা ভারত ভূমির কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি বিলাতে অবস্থান করিয়া সেখানকার নরনারীর ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, স্বাধীনচিত্ততা এবং গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসী ও শিক্ষার্থী হইলেও বিলাতের অধিবাসীরা তাঁহাকে যেরূপ সম্মান সমাদর প্রদর্শন এবং তাঁহার সহিত যেমন স্বজাতি-তুল্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই মনোহর। সেই ইংরেজ জাতি নেটালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং নেটালে যাইয়া তিনি যে বিলাতেরই মত আদর-সম্মান লাভ করিবেন—তেমনি উদার ও মধুর ব্যবহার পাইবেন তাহাতো নিশ্চিত। এইরূপ সুখের চিত্র হৃদয়ে আঁকিয়া মহাত্মা গান্ধী নেটালে উপস্থিত হইলেন।

নেটালের প্রধান নগর ডারবান; উহা ভারতসমুদ্রের কূলে অবস্থিত। জাহাজ ডারবানে নোঙ্গর করিল, গান্ধী অবতরণ করিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন! কূলে নামিয়াই তাঁহার মনে হইল, এটাকি সাম্যস্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক ইংরেজ জাতির উপনিবেশ!

মহাত্মা গান্ধী যে দিন ডারবানে পৌঁছিলেন তাহার পরদিনই তিনি সেখানকার বিচারালয়ে মক্কেলের মামলা চালাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্যারিষ্টারের পোষাক ও উষ্ণীষ পরিয়া আদালতে এটর্ণির পাশে বসিয়াছিলেন। কিন্তু কালা আদ্‌মি বলিয়া মাথা হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার প্রতি অতিশয় কঠোর ভাষায় হুকুম করা হইল! তিনি এই অনাচারে বিরক্ত হইয়া সেদিন বিচারালয় ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। তিনি একজন ব্যারিষ্টার—মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য বিচারালয়ে গিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহার প্রতি যেরূপ অধর্ম্মজনক ব্যবহার করা হইল, তাহাতেই মহাত্মা গান্ধী বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, সে দেশে ভারতবাসীদিগের সহিত ইংরেজ উপনিবেশিকেরা কেমন ব্যবহার করেন!

যে মোকদ্দমা চালনায় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছেন তাহার জন্য মহাত্মাকে ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়া নগরে যাইতে হইল। তিনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া রেলের গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ডারবান ছাড়িয়া পীটারম্যারিস্‌বার্গে পৌঁছিল। সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ আরোহী আসিয়া দেখিলেন একটা কালা আদ্‌মি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে! আর কি সহ্য হয়, অমনি সে স্বজাতীয় গার্ডকে ডাকিয়া আনিলেন; গার্ড আসিয়া সেই দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যস্ত সুসভ্য ভাষায় কঠোরভাবে গান্ধীকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবার জন্য হুকুমের উপর হুকুম চালাইলেন!

মহাত্মা গান্ধী কিন্তু শান্তভাবে গার্ডকে বুঝাইতে চাহিলেন, যে তিনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াই সে গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছেন। গার্ড সে কথায় মোটেই কাণ দিল না—অধিকন্তু জোর করিয়া গান্ধীকে সেই গাড়ী হইতে নামাইয়া তাঁহার জিনিষ পত্র টানিয়া প্লাটফরমে ফেলিয়া দিল—গাড়ী ছাড়িয়া দিল !! তখন রাত্রিকাল, গান্ধী অতিশয় ভয়ে ভয়ে সে রাত্রি তথাকার বিশ্রামগৃহে কাটাইয়া দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, এটা কি ন্যায়পরায়ণ দুর্ব্বলের আশ্রয় ইংরেজের উপনিবেশ ? সে দেশে কৃষ্ণকায় ভারতবাসীর অবস্থা যে কিরূপ সে বিষয়ে মহাত্মার জ্ঞান আরও অনেকটা বাড়িল।

যাহাহউক, তিনি নেটালের রাজসীমা ছাড়িয়া ওলন্দাজ-বংশ-সম্ভূত বুয়রগণের রাজ্য—ট্রান্স-ভালে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে গাড়ীতে প্রিটোরিয়া যাইতেছিলেন তাহা পাডিবার্গ নামক স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে একজন ওলন্দাজ গার্ড মহাত্মা গান্ধীকে বসিবার স্থান হইতে নামিয়া গার্ডের পায়ের তলে বসিবার জন্য হুকুম করিলেন ! মহাত্মা গান্ধী এই হুকুমের প্রতিবাদ করা মাত্র সেই বীর-পুঙ্গব প্রচণ্ডবেগে গান্ধীজীর মুখে ঘুসি মারিল ! গান্ধীজী কিন্তু তবু আপন আসন ছাড়িলেন না। নরপশুটার ইহাতে আরো রাগ হইল, সে পুনরায় গান্ধীজীকে ঘুসি মারিল। গাড়ীর আরোহীরা এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক কষ্টে পশুটাকে থামাইয়া দিলেন ! সুতরাং গান্ধীজীকে সে যাত্রায় আর মার খাইতে হইল না।

গাড়ী জোহান্সবার্গ নামক স্থানে আসিল, মহাত্মা গান্ধী বিশ্রামের জন্য এখানে নামিলেন। আরোহীদিগের আহার ও থাকিবার জন্য এই ষ্টেসনে 'গ্রাণ্ড ন্যাসনাল' নামে একটা হোটেল আছে। বহু চেষ্টায়ও মহাত্মা গান্ধী ঐ হোটেলে থাকিবার স্থান পাইলেন না, কারণ তাঁহার গায়ের চামড়া কালো। এই সকল ব্যাপার—শাদায় কালায় ভেদ—দেখিয়া মহাত্মা

গান্ধীর কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, যদি তিনি মোকদ্দমার দায়িত্ব লইয়া সেখানে আট্‌কা না পড়িতেন, তবে তন্মুহূর্ত্তেই ভারতে ফিরিতেন।

সেই সুসভ্য উপনিবেশিকগণের সৎব্যবহার লাভ করিতে করিতে গান্ধী ট্রান্স-ভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ায় পৌঁছিলেন। এখানে প্রজা-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। ট্রান্স-ভালের প্রেসিডেণ্টের নাম ক্রুগার। ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—ইংরেজের সহিত যুদ্ধের ফলে ইনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী একদিন প্রিটোরিয়াতে প্রেসিডেণ্ট্ ক্রুগারের বাড়ীর সম্মুখের ফুটপথদিয়া যাইতেছিলেন। কালা আদমির এহেন প্রগল্‌ভতা রাস্তার পাহারাওয়ালার প্রাণে সহিল না; সে তাড়াতাড়ি আসিয়া মহাত্মা গান্ধীকে লাথি মারিয়া ফুটপথ হইতে তাড়াইয়া দিল!

কথায় আছে 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ' মানুষ একটু একটু করিয়া বিজ্ঞতা লাভ করে—বিজ্ঞতা বাড়িতে বাড়িতে শেষে তাঁহারা অতিশয় বিজ্ঞ হন। মহাত্মা গান্ধীর পক্ষেও তাহাই হইল। সেই সুসভ্য ইউরোপীয়-গণের উপনিবেশে—তাহারা কৃষ্ণবর্ণ জাতিসমূহের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছিল—নিজে বারংবার ভোগ করিয়া তাহা বেশ ভালরূপে তিনি বুঝিয়া লইলেন। কেবল তাহা নহে, তিনি বিশিষ্ট ধৈর্য্যের সহিত সে সকল অসদ্ব্যবহার ও অবমাননা নীরবে সহিয়া যাইতে লাগিলেন। আর দিনরাত দেশবাসীদিগের এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা কি উপায়ে দূর করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

একটা মামলার জন্যই গান্ধী আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার যথেষ্ট অবসর ছিল। তিনি সেই অবসরকাল কাটাইবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাম্যবাদী (বোলসেভিক মতের প্রবর্ত্তয়িতা) কাউণ্ট টলষ্টয় এবং বটলার প্রভৃতির সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িলেন। এই সময়ে খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলও তিনি পাঠ করিলেন। যাহা

হউক, এই সব গ্রন্থ পাঠে গান্ধীর যে কেবল অভিজ্ঞতা বাড়িল তাহা নহে, তিনি কর্ত্তব্যের পথেও দৃঢ়পদে দাঁড়াইবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইলেন।

যাহা হউক, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইতে না হইতেই মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ ফুরাইল—মোকদ্দমা শেষ হইল। সুতরাং তিনি দেশে ফিরিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নেটালের ভারতবাসীরা গান্ধীর জন্য একটা বিপুল বিদায়-ভোজের আয়োজন করিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, মহাত্মা গান্ধীর বিদায়-ভোজ—তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়িভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা করিল এবং সেই ব্যবস্থার ফলেই তিনি আজ সমুদয় মনুষ্যজগতের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি লাভের পাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

(৪)

নেটালের ভারতবাসীরা যে দিন মহাত্মা গান্ধীকে বিদায় কালে আপ্যায়িত করেন, সেই দিন বিকাল বেলাই তিনি 'নেটাল মার্কারি' নামক একখানা খবরের কাগজে একটা প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

নেটালে যে ব্যবস্থাপক সভা আছে, সেই সভার সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ইংরেজেরা যেমন ভোট দিতে পারিতেন—ভারতবাসীরাও তেমনি ভোট দিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ সময়ে এমন একটা আইন তৈয়ার হইতেছিল যে, তাহাতে ভারতবাসীদিগের আর ঐরূপ ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

নেটালে ভারতবাসীদিগের প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করা হয়, তাহা-তেই মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের দুরবস্থার বিষয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তবু ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যনির্ব্বাচন করিবার অধিকার থাকায়, ভারত-বাসীরা কোন কোন বিষয়ে এক আধটুকু সুবিধা ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু সে দেশবাসী কাফ্রীরা ঐসকল সুবিধা ও স্বত্ব ভোগ করিতে পাইত

না। এই প্রস্তাবিত নূতন আইন পাশ হইলে ভারতবাসীদিগকে যে কত শত অসুবিধা ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাত্মা গান্ধীর সে কথা বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

সেই ভোজের সভায়ই গান্ধী সমবেত স্বদেশবাসীদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এই আইন পাশ হইলে ভারতবাসীরাও—যেমন ধনবান্, উন্নত বা শিক্ষিত না হউন—আইনানুসারে কাফ্রীদিগের মত হীন হইবেন। সুতরাং তখন তাহাদের উপর যে অত্যাচার চলিবে তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। সমাগত লোক সকল এই বার্ত্তা শুনিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন।

গান্ধীর পরামর্শে ভারতবাসীরা একটা আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, উহা নেটাল গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠাইয়া আইনের প্রতিবাদ করা হইল। তাহার আগে গান্ধী স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে তার করিয়াও অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, "আইনটী যেন তাড়াতাড়ি পাশ করা না হয়।" গভর্ণমেণ্ট কিন্তু সে কথা শুনিলেন না, এই আইনটী পাশ করিয়া লইলেন।

তবে এই প্রতিবাদের ফলে একটা ফল এই ফলিল যে, নেটালের সংবাদপত্র সকলে ভারতবাসীদিগের প্রতিবাদ যে সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ, সে কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। চিরনিদ্রিত প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ বুঝিলেন—প্রতিবাদকারীরা দুর্ব্বল নহে—উপেক্ষাযোগ্য অথবা "যো হুজুরের" দল নহে।

আর গান্ধীর দিক্ দিয়াও একটা অতিবড় অভিজ্ঞতা লাভ হইল। তিনি এই ব্যাপারে বুঝিলেন যে, উপযুক্ত চালক ও পরামর্শদাতা পাইলে ভারতীয়দিগের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি নিমেষে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। আত্মশক্তি জাগরিত হইলে জগতে তাহার পরাজয় কস্মিন কালেও ঘটে না,

এ তত্ত্ব মহাত্মা গান্ধীর বেশ ভাল রকম জানা ছিল। সুতরাং বিলটীর প্রতিরোধ করিতে না পারিলেও তিনি ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পূর্ণ উদ্যোগী হইলেন।

নেটালের ভারতীয়গণ মহাত্মা গান্ধীর সকল যুক্তিই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বুঝিলেন ; কিন্তু ইহাও তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তিনি সেখানে না থাকিলে কোন কাজই হইবে না। সুতরাং তাঁহারা গান্ধীকে সেখানে রাখিবার জন্য একবাক্যে অনুরোধ করিলে, তিনিও তাহাতে রাজী হইলেন। গান্ধী স্পষ্টই বলিলেন যে, ভারতবাসীদিগের উপকারের জন্য কোন কাজ করিয়া তিনি এক পয়সাও লইবেন না। তিনি সেখানে ব্যারিষ্টারী করিয়া —তাহাতে যত অপমান বা লাঞ্ছনাই ঘটুক না কেন—জীবনযাপন করিবেন। ভারতীয়গণও একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যাহাতে মহাত্মা গান্ধীর ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় বেশ ভালরূপে চলে তাহার বন্দোবস্ত তাঁহারা নিশ্চিতই করিবেন। নিঃস্বার্থ পরোপকারী মহাত্মা গান্ধী নিজের অর্থ, সম্মান ও যশ প্রভৃতির আশা ত্যাগ করিয়া—সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অপরিচিত হইলেও—স্বদেশ-বাসীদিগের ভাগ্য-সূত্রের সহিত নিজের ভাগ্য-সূত্র এক করিয়া নিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস" নামে একটা সভা স্থাপিত হইল—মহাত্মা গান্ধী তাহার পরিচালক হইলেন। তাহা ছাড়া লোকমত গঠন ও জনশক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার জন্যও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইল। তত্রত্য ভারতীয়দিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য এই সময়েই "নেটাল ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সোসাইটী" স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সভাসমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একদল যুবক মহাত্মা গান্ধীর ইঙ্গিত মত অক্লান্তভাবে খাটিতে লাগিল।

এবার গান্ধী নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি নেটালের সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য আবেদন করিলেন।

এবার আবার সেখানকার শ্বেতাঙ্গ আইন ব্যবসায়ীরা ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহারা ঘোরতর প্রতিবাদদ্বারা জানাইলেন যে, কালা আদ্‌মিরা কখন শাদা চামড়াওয়ালাদের সঙ্গে সমান অধিকার পাইতে পারে না! সেখানে "নেটাল আইন সমিতি" নামে একটা সভা আছে; যদিও উহার নাম আইন সমিতি, তবু কিন্তু সে বে-আইনী চাল চালিতে একটু মাত্র ইতস্ততঃ করিল না। সমিতি মন্তব্য করিলেন যে, "কৃষ্ণাঙ্গগণ যে উপনিবেশের বিচারালয়ে আইন ব্যবসায়ী হইতে পারে এমন কোন নিয়ম নাই।" কিন্তু দৈত্যকুলে যেমন প্রহ্লাদের জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ সেই সময়ে তথাকার সুপ্রিম কোর্টেও ন্যায়বান্ বিচারকগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তাহারা প্রতিবাদকারীদিগের অসার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে তথায় ব্যারিষ্টারী করিতে অনুমতি দিলেন। ইহার পর তিনি প্রকৃতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

পূর্ব্বে যে আইনটীর কথা বলা হইয়াছিল, উহার নাম "এশিয়াটিক্ এক্স্‌ক্লুসন্ এ্যাক্ট্" বা এশিয়াবাসীর বহিষ্করণ আইন। নেটালের ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইলেও বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা সম্রাটের অনুমোদন না পাইলে কোন আইনই কার্য্যকর হয় না। সুতরাং এই আইনও সম্রাটের অনুমোদনের জন্য বিলাতে পাঠান হইল। মহাত্মা গান্ধী নেটালের ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটা প্রতিবাদ ছাপাইয়া তাহাতে নেটালস্থিত বহু ভারতবাসীর স্বাক্ষর করাইলেন, তার পর উহা বিলাতে উপনিবেশ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেনের পিতা মিঃ যোসেফ চেম্বারলেন এই সময়ে উপনিবেশসচিব ছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রেরিত প্রতিবাদপত্রের অকাট্য যুক্তিসমূহ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। উহাতে ভারতেশ্বরীর অনুমোদন রদ করিয়া দিলেন। সুতরাং মূল আইনটী মাটি

হইয়া গেল। কর্ম্মক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম চেষ্টা জয়লাভ করিল। কাজেই উপনিবেশের কর্ত্তারা আইনটী তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

এতদিন যাহারা কালা আদমিদের উপর যা খুসী তাই করিয়া আসিতে ছিল, তাহারা আজ সেই কালা আদমিদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইল, ইহাতে তাহাদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, আইন রচনার কর্ত্তা যখন ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ, তখন তাহাদের জেদ্ বজায় রাখিতে আর বিলম্ব হইল না। এক আইন রদের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন আর এক আইন রচিত হইয়া পাশ হইল। এবার আইনটীর খসড়াটাই উপনিবেশ-সচিবকে দেখাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং নূতন আইনটাতে মহারাণীর সম্মতি পাইতে কোনই গোল হইল না। ভারতীয়গণের শত আবেদন ও যুক্তিতর্ক বৃথা হইয়া গেল। অতএব উহা পাকা আইনে পরিণত হইল। ইহার ফলে নিয়ম হইলযে, দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ব্বে যে সকল ভারতবাসীর ভোট দিবার অধিকার ছিল, তাহারা ব্যতীত অন্য কোন এশিয়াবাসীর ভোট দিবার ক্ষমতা রহিল না। কারণ আইনে লেখা হইয়াছিল যে, যে দেশে পার্লামেণ্টের ব্যবস্থানুযায়ী নির্ব্বাচিত সদস্যদ্বারা শাসন-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—শ্বেতাঙ্গ না হইলে—সে দেশের কোন লোক সকৌন্সিল গবর্ণরের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভোটদাতা হইতে পারিবে না। রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে ভারতীয়দিগকে দূর করিবার জন্য প্রথমে এই চাল চালা হইল; কিন্তু ইহাতেও ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণের হিংসা-বৃত্তির নিবৃত্তি হইল না।

শ্বেতাঙ্গগণ, ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দূর করিয়া দিবার জন্যও নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। কারণ এই সকল বণিক এমন ভাবে তথায় ব্যবসায় চালাইতেছিল যে, শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ কোনরূপেই তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছিল না।

শত সহস্র অসুবিধার ভিতর দিয়াও ভারতীয় বণিকেরা ধনবান হইয়া তথায় দৃঢ়-মূল হইতেছিল। শ্বেতাঙ্গগণের প্রাণে ইহা একবারে অসহ্য হইল।

এবার তাহারা আর একটা আইন তৈয়ার করিল, তাহাতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণের সম্বন্ধে যে সকল সর্ত্ত ছিল, তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মের একটা ধারা যোগকরা হইল যে,—"প্রথম চুক্তির পাঁচ বৎসর অতীত হইলে শ্রমিক-দিগকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতেই হইবে, নতুবা তাহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আজীবন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপে কাজ করিতে হইবে। যাহারা আজীবন শ্রমিক হইবে, নয় বৎসরে তাহাদিগের বেতন বাড়িয়া মাসিক ১৫৲ পনর টাকা হইবে, ইহার উপর আর বাড়িবে না। যদি কেহ এই শেষোক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ফৌজদারী আসামী বলিয়া গণ্য করা হইবে।"

কথা আছে "সাধও করে, মনও পোড়ে"; দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ দলের অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। ভারতের শ্রমজীবী না হইলে উহা-দিগকে নেটাল হইতে পটল তুলিতে হয়—ইহা জানা থাকিলেও আবার উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য কতই চেষ্টা—কতই না ফন্দী আঁটা! কিন্তু ঘরে বসিয়া ফন্দী আঁটিলে আর চলিবে না! তাহারা ত আইনের বাঁধন খুব শক্ত করিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট যে, সেই চুক্তিতে শ্রমিক পাঠাইবেন তাহার প্রমাণ কি? অথচ এত সস্তায় পৃথিবীর আর কোন দেশ হইতেই শ্রমিক পাইবার উপায় নাই।

ভাবিয়া চিন্তিয়া নেটাল-গভর্ণমেণ্ট ভারতসরকারের কাছে দুই জন প্রতিনিধি পাঠাইলেন। প্রতিনিধিরা ভারতসরকারের অনেক তোয়াজ করিলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই শেষ নিয়মটাতে ভারত সরকারকে রাজি করাইতে পারিলেন না।

কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা নিরুৎসাহ হইলেন না। ঔপনিবেশিক

শ্বেতাঙ্গগণ আইনের পূর্ব্বোক্ত অংশটা ত্যাগ করিয়া নিয়ম করিলেন যে, যাহারা আজীবন শ্রমিক না হইয়া নেটালে বাস করিবে তাহাদিগকে বছরে মাথাগুন্তি তিন পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫৲ টাকা টেক্স দিতে হইবে।” এইরূপে স্বার্থপরতার কাছে মনুষ্যত্বকে বলি দিতে নেটালের শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ একটুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। ঔপনিবেশিকেরাত স্বার্থের দায়ে এই কর্ম্ম করিলই—বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত এইরূপ একটা আইন পাশ করিতে বিরত হইলেন না ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। গান্ধীর সমুদয় যুক্তিতর্ক ও আবেদন অরণ্যে-রোদন হইল। বিলাতের শক্তিশালী সংবাদপত্রসকলও এইরূপ আইন যে অসভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিরোধী—স্পষ্টভাষায় তাহা প্রকাশ করিলেও—তাহাতে কোন ফলই ফলিল না।

মহাত্মা গান্ধী বুঝিলেন, প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষার জন্য এবার কঠোর প্রতিযোগিতায় নামিতে হইবে; সুতরাং প্রবল উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায়ে কাজ করা আবশ্যক। তিনি এই ভয়াবহ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য দৃঢ়পদে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিন বছরেরও বেশি কাল তিনি স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া সেই সুদূর বিদেশে একাকী কাল কাটাইতেছিলেন; সুতরাং একবার দেশে ফিরিয়া স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তদুদ্দেশে মহাত্মা গান্ধী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতবাসী বাস করিতেছে, তাহারা তথায় কিরূপ দুর্দ্দশায় ও শোচনীয়ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী সে সকল কাহিনী মুদ্রিত করিয়া ভারতের নেতাদিগের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। এই পুস্তকের নাম দেওয়া হইয়াছিল “খোলা চিঠি”।

এক্ষণে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি উহা পুনরায় ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিলেন। সেই খোলা চিঠিতে এবং আফ্রিকার সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া ভারতের লোকেরা মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। সুতরাং এই স্বার্থত্যাগী কর্ম্মবীরকে সকলে বিপুল সম্মান ও আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও জনসাধারণের কাছে আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী অকপটে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সেই করুণকাহিনী যাঁহার কর্ণগোচর হইল তিনিই চক্ষের জল না ফেলিয়া পারিলেন না। ভারতের তাবৎলোক এই হতভাগ্য দেশবাসীদিগের প্রতি একান্তমনে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে একটা বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

পৃথিবীর সকলদেশ হইতে সংবাদ দিবার জন্য একটা সাহেব কোম্পানী আছে, উহার নাম "রয়টার"। ভারতবর্ষে তাহাদের যে সংবাদদাতা আছেন তিনি ভারতের এই আন্দোলনের সংবাদটা তারযোগে বিলাতে পাঠাইলেন। সংবাদটা যে ভাষায় পাঠান হইল, তাহাকে সত্য বলিলে, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। বিলাত হইতে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া খবরটা "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইয়া নেটালে পৌঁছিল। নেটালের ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গেরা একেই মহাত্মা গান্ধীর উপর চটা ছিল, এবার রয়টারের প্রেরিত বিকৃত সংবাদ পাইয়া তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল যে, এই গান্ধীই যত নষ্টের গোড়া, সুতরাং নেটালের শ্বেতাঙ্গদল সভাসমিতি করিয়া মহাত্মা গান্ধীর কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। এতকাল নেটালবাসী-শ্বেতাঙ্গগণ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যে ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন—সেই সত্য তত্ত্বটাও তাহারা সভায় দাঁড়াইয়া উচু গলায় প্রচার করিতে লাগিল। ভারতীয়গণ শ্বেতাঙ্গ-দিগের হাব-ভাব ও সভাসমিতি দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইল, তাহারা

গান্ধীকে আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

মহাত্মা গান্ধী নেটালপ্রবাসী ভারতীয়গণের পত্র পাইলেও তাহাদেরই উপকারের জন্য তিনি ভারতে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিলেন। মহাত্মা ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের বিপুল জনসমাজ একটা প্রচণ্ড আলোচনার সৃষ্টি করিলে, নিশ্চিতই ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ-গণের কীর্ত্তিকথা জগদ্বাসীর কর্ণগোচর হইবে; তাহা না হইলে উহাদের কথা কাহারো কাণে পৌঁছান সম্ভব নহে।

যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতায় একটা বক্তৃতার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একটা জরুরী তারে খবর পাইলেন যে, "নেটালের পার্লামেণ্টের অধিবেশনে আর বিলম্ব নাই, এসময়ে মহাত্মা গান্ধীর সেখানে উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক, নতুবা ভারতীয়গণের বিপদের আর সীমা থাকিবে না।"

এই খবর পাইয়াই মহাত্মা গান্ধী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কলিকাতায় আর বিলম্ব করিলেন না, তাড়াতাড়ি বোম্বাই চলিয়া গেলেন এবং বোম্বাই পৌছামাত্র টিকেট কিনিয়া স্ত্রীপুত্রাদি সহ দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। যে জাহাজে মহাত্মা গান্ধী যাত্রা করিলেন তাহার নাম "কোরল্যাণ্ড"।

কাকতালীয় ন্যায়ের মত এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটিল। নবেম্বর মাসের ২৮শে কোরল্যাণ্ড বোম্বাই ছাড়িয়া গেল—আবার ঠিক্ দুদিন পরেই ছয়শত ভারতীয় আরোহী লইয়া "নাদেরী" নামক আর একখানা জাহাজও বোম্বাই হইতে নেটালের দিকে যাত্রা করিল। যাত্রায় একটু আগপাছ হইলেও এই দুই জাহাজই এক সঙ্গে ডারবানে উপস্থিত হইল।

"কোয়ারাণ্টাইন" নামে একটা আইন আছে; কোন স্থান হইতে যাহাতে সংক্রামক ব্যাধি কোন সহরে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই আইনের সৃষ্টি। যাত্রী বা মাল লইয়া কোন জাহাজ বন্দরে আসিলে কয়েকদিন তাহাকে কূলে ভিড়িতে বা লোকজনকে মালপত্র নামাইতে দেওয়া হয় না, কেননা উহার সহিত পাছে বা সংক্রামক ব্যাধির বীজ দেশে প্রবেশ করে। এই আইন অনুসারে কোরল্যাণ্ড ও নাদেরী জাহাজকে ডারবানের বন্দরে ভিড়িতে দেওয়া হইল না। উহারা সমুদ্রে নোঙ্গর করিয়া রহিল। জাহাজের অধ্যক্ষ বা কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ "অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য" জাহাজ আটক রাখিবার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াও কোন ফল পাইলেন না।

এদিকে পূর্ব্বেই নেটালবাসী ঔপনিবেশিকগণ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী ডারবানে আসিতেছেন। এক্ষণে ডারবানে এই সংবাদও প্রচারিত হইল যে, "তিনি এবার একা আসেন নাই—জাহাজ বোঝাই করিয়া অসংখ্য শিল্পনিপুণ লোক লইয়া আসিয়াছেন! ঐ সকল কারিকর নেটালের ইউরোপীয়দিগকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া সমুদয় শিল্পকার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইবে।" কোথায় ভারতীয় শ্রমিকদিগকে তাড়াইবার জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছিল, তাহা দূরে যাউক—গান্ধী এক্ষণে ভারতীয় শিল্পী আমদানী করিয়া শ্বেতাঙ্গদিগের সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত! সুতরাং তাহারা কোন মতেই এই দুই জাহাজের যাত্রীদিগকে কূলে নামিতে দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। ডারবানে ভয়ানক উত্তেজনা চলিতে লাগিল, শ্বেতাঙ্গশ্রমজীবীরা সভা-সমিতি করিয়া বেশ ভালরকমে দল পাকাইতে লাগিল—কেহ কেহ জাহাজ দুখানা সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দিবার পরামর্শও দিল। অনেক জল্পনা কল্পনার পর শ্বেতাঙ্গেরা স্থির করিলেন যে, তাহারা বলপূর্ব্বক যাত্রিগণকে কূলে নামিতে

দিবে না। স্বয়ং এটর্ণিজেনারেল এস্‌কম্বী ইহাদের সহায় হইলেন—নেটাল গভর্ণমেণ্টও তলে তলে প্রতিবাদীদের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

কোয়ারাণ্টাইন উপলক্ষে জাহাজ দুখানা সমুদ্রে আট্‌কাইয়া রাখাতে শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবিগণের দল পাকাইবার সুযোগ হইয়াছিল। এমন কি, যে সকল শ্বেতাঙ্গ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে প্রস্তুত তাহাদের একটা তালিকা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল! ভারতীয়েরা শ্বেতাঙ্গদিগের এই উত্তেজনা-পূর্ণ অবস্থার কথা মহাত্মা গান্ধী ও যাত্রীদিগকে জানাইল।

মহাত্মা গান্ধী নিজের ওজন বুঝিতেন—কোন্ অবস্থায় যে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বেশ জানিতেন; সুতরাং শ্বেতাঙ্গগণের উত্তেজনায় তিনি কিছু মাত্র ভয় পাইলেন না। তিনি কেবল আইন মান্য করিবার জন্য কোয়ারাণ্টাইনের সময় অতীত হওয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে চব্বিশ দিন চলিয়া গেল; কিন্তু নেটালের কর্ত্তৃপক্ষ জাহাজ কূলে লাগাইতে বা যাত্রী নামাইতে আদেশ দিলেন না। তখন জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিদিন বাইশশত টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া নেটাল গভর্ণমেণ্টের কাছে এক কড়া চিঠি লিখিলেন। গতিক ভাল নহে বুঝিয়া, এটর্ণি-জেনারেল তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তরে যাত্রী নামাইবার হুকুম দিলেন।

ডারবানের শ্বেতাঙ্গগণ গভর্ণমেণ্টের পরোক্ষ সহায়তার বল পাইয়া মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের আগড়ম্ বাগড়ম্ দেখিয়া ভয়ে জাহাজ দুখানা যাত্রী লইয়া ফিরিয়া যাইবে, গভর্ণমেণ্টও দাঙ্গা জুলুমের ভয়ে জাহাজ লাগাইবার হুকুম দিবেন না। সমুদয় কল্পনাই নিমিষের মধ্যে বিলয় পাইল। তখন উত্তেজিত জনসংঘের সর্দ্দার হারীস্পার্ক্‌স্ (ইনি একজন উচুদরের সৈনিক কর্ম্মচারী) গান্ধী যে জাহাজে ছিলেন, সেই জাহাজের অধ্যক্ষকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে,

"যাত্রীদিগকে কূলে নামাইলে ভয়ানক বিপদ ঘটিবে।" এই ভয় দেখানর সহিত তিনি একটু দাতব্য খরচ করিবার প্রস্তাব করিয়াও জানাইলেন যে, যাত্রীদিগকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে যে ব্যয় হইবে, তাহা উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গগণ বহন করিতে রাজি আছেন।"

জাহাজের অধ্যক্ষ মহাত্মা গান্ধীকে এই পত্র দেখাইলেন। তিনিও যাত্রীদিগকে পত্র ও তাহার উদ্দেশ্য বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। যাত্রীরা এক বাক্যে জানাইল যে, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর আদেশ প্রাণদিয়া পালিবে—তবু এ অবমাননার বোঝা—কাপুরুষতার কলঙ্কচিহ্ন লইয়া তাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবে না।" জাহাজের অধ্যক্ষ হারীস্পার্ক্‌স্‌কে জানাইলেন যে "যাত্রীরা ফিরিয়া যাইতে রাজি নহে।" তারপর তিনি নির্ভীকভাবে "ইউনিয়ন জ্যাক্" নিশান উড়াইয়া কূলের দিকে জাহাজ চালাইয়া দিলেন।

নিজেদের শত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া শ্বেতাঙ্গগণ উন্মত্তভাবে ডকের দিকে ছুটিয়া চলিল। তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তি, বিকট চীৎকার ও আস্ফালনে সাগরের তটভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল! এটর্ণি জেনারেল এবার বড়ই দোটানায় পড়িলেন। একদিকে আইনানুসারে যাত্রী-দিগকে নিরাপদে কূলে নামাইয়া দেওয়া, অন্য দিকে ক্ষিপ্তপ্রায় জনসংঘকে শান্তিভঙ্গ' হইতে নিবৃত্ত করা। যাহা হউক, তিনি দলবলসহ একখানা নৌকায় করিয়া জাহাজের কাছে আসিলেন, অধ্যক্ষকে কহিলেন "মিঃ মিল্‌নি! যাত্রীদিগকে আপনি জানাইয়া দিন্ যে, তাহারা দেশেরই মত এখানে নির'পদে নামিতে—চলিতে পারিবে, কেহ তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" তারপর তিনি কূলে ফিরিয়া মহারাণীর দোহাই দিয়া সেই উত্তেজিত জনসংঘকে সেখান হইতে সরাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া

দিলেন যে, পার্লেমেণ্টের অধিবেশন হইলেই এবিষয়ের একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে।

এটর্ণি জেনারেলের কথায় সেই রুদ্রমূর্ত্তিধারী জনসংঘ সেখান হইতে সরিয়া পড়িল বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে থাকিয়া গেল। দুই ঘণ্টা পর মহাত্মা গান্ধী যাত্রীদিগের সহিত কূলে নামিবার উদ্যোগ করিলেন; ইতিমধ্যে এটর্ণি জেনারেল একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারদ্বারা মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "জনতা এখনো একেবারে সরিয়া যায় নাই, সুতরাং আপনি যেন সন্ধ্যার আগে জাহাজ থেকে নামেন না।"

শ্রীযুক্ত পার্শি রুস্তমজী একজন ধনকুবের। তিনি মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ বন্ধু। মহাত্মা গান্ধী স্ত্রীপুত্রাদিকে সেই বন্ধুর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। নিজে সন্ধ্যার পর নামিবেন বলিয়াই স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে মিঃ লাউটন মাহত্মা গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইবার জন্য জাহাজে আসিলেন। ইনি নেটালের একজন ব্যারিষ্টার—শ্বেতাঙ্গ হইলেও অতিশয় উদারহৃদয়। তিনি গান্ধীর রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তখনই নামিবার প্রস্তাব করিলেন। মহাত্মা গান্ধী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

মিঃ লাউটনের সহিত মহাত্মা গান্ধী হাটিয়া চলিলেন। কতকদূর যাইতে না যাইতেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্য হইতে অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে চিনিয়া দারুণ কলরব করিতে লাগিল; সুতরাং জনতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তাঁহারা একখানা রিক্‌সা ভাড়া করিয়া তাড়াতাড়ি পথ চলিতে চাহিলেন, কিন্তু ভিড় ঠেলিয়া রিক্‌সা অধিকদূর যাইতে পারিল না। তখন আবার তাঁহারা হাটিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার জনতার চাপে পড়িয়া দুই বন্ধু পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। জনতা

মিঃ লাউটনকে ঠেলিয়া দূর করিয়া দিয়া মহাত্মা গান্ধীকে আক্রমণ করিল। চারিদিক হইতে প্রথমে ঢিল, পচাডিম, মাছ প্রভৃতি তাঁহার মাথায় পড়িতে লাগিল, তার পর অজস্র প্রহারে মহাত্মা গান্ধীকে আধমরা করিয়া তুলিল। এমন কি মহাত্মা গান্ধীকে একস্থানে দাঁড় করাইয়া এই নরপশুরা বারংবার তাঁহাকে লাথি মারিতে লাগিল!

দারবানের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেক্‌জান্দারের পত্নী দূর হইতে এই পাশবিক ব্যাপার দেখিয়া দ্রুতপদে ধাইয়া আসিলেন। তিনি উন্মত্ত জনসমূহকে প্রহার হইতে থামাইবার জন্য সহসা নিজের ছাতাটী খুলিয়া মহাত্মা গান্ধীর মাথার উপর ধরিলেন। বাধা পাইয়া প্রহারকারিগণের চমক্ ভাঙ্গিল—তাহারা চাহিয়া দখিল যে, ইনি মিসেস্ আলেক্‌জান্দার! তৎক্ষণাৎ তাহারা থামিয়া গেল। মিসেস্ আলেক্‌জান্দার গান্ধীকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে একটী ভারতীয় বালক দৌড়িয়া যাইয়া পুলিশে খবর দিয়াছিল যে, ক্রোধান্ধ জনতা গান্ধীকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে! পুলিশ খবর পাইয়া সদল-বলে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইল। জনতা পুলিশের আগমন দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। পুলিশেরা মহাত্মা গান্ধীকে নিজের আশ্রয়ে রাখিতে চাহিল, তিনি কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্ত্রীপুত্রদিগকে দেখিবার জন্য রুস্তমজীর ঘরেই গেলেন।

ধীরে ধীরে উন্মত্ত জনতা সন্ধ্যার আঁধারে যাইয়া রুস্তমজীর বাড়ী ঘিড়িয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাহাদের বিকট চীৎকার ও উন্মত্ত আস্ফালনের রব শুনা যাইতে লাগিল। এদিকে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেক্‌জান্দার মহাত্মা গান্ধীকে পুলিশের বেশে সেখান হইতে পলাইবার পরামর্শ দিলেন; নতুবা তাঁহার স্ত্রীপুত্রের ঘোরতর বিপদ্—এমন কি বন্ধু রুস্তমজীর বাড়ী ভস্মীভূত হইবার আশঙ্কাও জানাইলেন।

অগত্যা মহাত্মা গান্ধী এই উপদেশ পালন করিলেন, তিনি একজন কনষ্টেবলের পোষাক পরিয়া অপর একজন গোয়েন্দা পুলিষের সহিত বন্ধুগৃহহইতে বাহির হইয়া পুলিশের আশ্রয় লইলেন। উত্তেজিত জনতাও রাত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

দেশের লোকের উত্তেজনার যখন হ্রাস হইল, তখন নেটালের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় একটু ভাবিবার অবসর পাইল। অনেকেই তখন আলোচনা করিতে লাগিল যে, গান্ধীকে তো যথেষ্ট অপমান করা হইল! কিন্তু গান্ধী তাহাদের বিরুদ্ধে কি কি কথা বলিয়াছে তাহা দেখা উচিত। এইরূপ আলোচনার পর তাহারা মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত পুস্তিকা পাঠ করিল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তিনি ডারবানে যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, ভারতে প্রচারিত পুস্তকে তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। অথচ মিথ্যা একটা হুজুগে পড়িয়া তাহারা মহাত্মা গান্ধীকে অকথ্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়াছে! এতদিন পর্য্যন্ত যে "নেটাল মার্করী" পত্রিকা গান্ধীর মুণ্ডপাত করিতেছিল —এক্ষণে সে আমতা আমতা করিয়া সুর বদলাইল—শেষে মহাত্মা গান্ধী যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষীর কাজ করিয়াছেন—সেকথাই প্রচার করিতে লাগিল। আর বেশ কঠোর মন্তব্যের সহিত রয়টারের প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদও করিল। কলসীর কান্দায় আহত নিত্যানন্দের মত প্রহৃত ও অবমানিত গান্ধীর এক্ষেত্রেও জয় হইল।

(৫)

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয়গণের যে সকল উপনিবেশ আছে, সে সকলের মধ্যে নেটাল সমুদ্রকূলে; উহা ইংরেজ উপনিবেশ। ইহার পশ্চিমে বুয়র (কৃষক) গণের উপনিবেশ আরঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেট্ ও ট্রান্স্‌ভাল। এই তিন উপনিবেশ প্রায় এক সংলগ্ন সীমায় অবস্থিত।

নিদারুণ অত্যাচার অবমাননা সহিয়াও মহাত্মা গান্ধী নিজের সংকল্প

হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি ভারতীয়গণের স্বত্বরক্ষা ও তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। আর ভারতীয়গণ যাহাতে শিক্ষিত হইতে পারে, সেজন্য বিশেষ আয়োজন করিলেন। এই সকল ব্যাপারে দুই বছর কাটিয়া গেল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ আসিল। সেই বিদেশে—উপনিবেশেও ইংরাজ ওলন্দাজে বেশ টক্কর লাগিয়া গেল। ট্রান্স্‌ভাল ও আরঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেটের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাঁধিল। বুয়রদিগকে শাসন করিবার জন্য ইংরেজগণ নেটাল হইতে সৈন্য পাঠাইলেন।

ক্ষমাদ্বারা অক্ষমাকে, প্রেমদ্বারা অপ্রেমকে, সহায়তাদ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করাই গান্ধীর নীতি। ইংরেজ বুয়রে যুদ্ধ লাগিলে, তিনি এই নীতির আশ্রয় করিবার সুযোগ পাইলেন। ভারতীয়গণ কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ ও রাজভক্ত—বিদ্বেষপরায়ণ ঔপনিবেশিকদিগকে তাহার প্রমাণ দেওয়ার ইহাই উত্তম সুযোগ। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে ভারতীয় লোকসকলও অকুণ্ঠিতচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উদ্যোগী হইল। ঔপনিবেশিক সরকারের নিকট এজন্য আবেদন করা হইল। "ভারতবাসীদিগের কাছে গভর্ণমেণ্ট কোন সহায়তার আকাঙ্ক্ষা করেন না" আবেদনের উত্তরে গভর্ণমেণ্ট এই কথা জানাইলেন! মহাত্মা গান্ধীর প্রথম উদ্যম বিফল হইল।

যত বাধা—যেমন বিপদই আসুক না কেন, মহাত্মা গান্ধী কখনো কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত বা নিবৃত্ত হন না, ইহাই তাঁহার স্বভাব। প্রথম চেষ্টায় কোন ফল ফলিল না দেখিয়া তাঁহার মনে একটু মাত্র নিরাশা স্থান পাইল না। তিনি পুনরায় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, সুযোগ বারংবার আসে না। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ চিরকালই ভারতীয়দিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া ঠাট্টা করিত এবং বিপদ্ দেখিলে যে তাহারা সকলের প্রথম পলাইবে সে কথাই বলিত।

এদিকে মহাত্মা গান্ধী সেই কথার প্রতিবাদে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে—"ভারতবাসীরা যেমন শ্বেতাঙ্গের সহিত সমান অধিকার চাহে, তেমন তাহারা বিপদের কালেও তুল্যরূপ বিপদ্ বরণ করিয়া লইবে।" বুয়র যুদ্ধই সেই উক্তির সত্যতা প্রমাণের যথার্থ সুযোগ, সুতরাং প্রথমবার বাধা পাইয়াও মহাত্মা গান্ধী পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

নেটাল গভর্ণমেণ্টের জনৈক সদস্যের নাম আর জেম্‌সন্; মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সহিত দেখা করিয়া নিজের উদ্দেশ্যের কথা জানাইলেন। সদস্য মহোদয় অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিয়া দিলেন যে, "অশিক্ষিতলোক দিয়া তাহাদের কোন উপকারই হইবে না—এমন কি ভৃত্যের কাজও নহে।"

দুইবারের চেষ্টা ব্যর্থ হইল—গান্ধীর সংকল্প কিন্তু টলিল না। তিনি এবার বন্ধুবর মিঃ লাউটনের সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিলেন। এই সহৃদয় ইংরেজ বন্ধুর উৎসাহে মহাত্মাজী আবার কর্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন পত্র পাঠাইলেন। এই আবেদনের দশাও আগের দুইবারের চেষ্টার মতই হইল।

নেটাল গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন যে, খুব সামান্য চেষ্টায়ই বুয়ারদিগকে দমন করা যাইবে; কিন্তু কার্য্যকালে সেই কল্পনা একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। বুয়রবীর জেনারেল জুবার্ট, জেনারেল বোথা, ডিওয়েট, ডিংলেরে ও ক্রঞ্জি প্রভৃতির বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলে ইংরেজকে যত বেগ পাইতে হইল, তাহা সংবাদপত্রের পাঠকগণ বেশ অবগত আছেন। যুদ্ধ যখন বড় সঙ্গীন হইয়া উঠিল, তখন আর ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, এবার তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান করিলেন—মহাত্মাজীর আশাপূর্ণ হইল। তিনি একহাজার ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। ভারতীয় বণিক্‌গণ এই

দলের সাজপোষাক দিলেন; ডাক্তার বুথ ইহাদের পরিচালক এবং মহাত্মা গান্ধী সহকারী তত্বাবধায়ক হইলেন।

ইংরেজ সেনাপতি সার জর্জ্জ হোয়াইট্ হাজার সেনাসহ লেডিস্মিথে এবং অপর দুই দল ইংরেজ সৈন্য কিম্বার্লি ও মেফেকিং নগরে বুয়রগণ দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে—ইংলণ্ডের তৃতীয় সেনাপতি জেনারেল বুলার দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজপক্ষে প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিলেন। এই নবাগত প্রধান সেনাপতি জেনারেল বুলার বুয়র সেনানায়ক জেনারেল বোথার নিকট তিন তিন বার ভীষণ ভাবে পরাস্ত হন, এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্র বন্দুকের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। কি ভাবে যে এই ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল—ইহাতেই তাহা বুঝা যায়।

মহাত্মা গান্ধী নির্ভীকভাবে স্বেচ্ছাসেবকদল লইয়া এই ভয়াবহ মরণ ক্ষেত্র হইতে আহত ইংরেজ সেনাদিগকে বহন করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইতেছিলেন। বহু স্বেচ্ছাসেবক এই যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের প্রাণরক্ষা করিতে যাইয়া নিজেরা প্রাণ দিয়া ছিল। এই অশিক্ষিত ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণই লর্ড রবার্টসের নিহত পুত্রকে অসংখ্য মৃতদেহের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাতমাইল দূরে একটা হাসপাতালে পৌছিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, যুদ্ধ শেষ হইল—সরকারী রিপোর্টে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সাহস ও গুণের কথা প্রচারিত হইল; ডেচ্‌পাচে মহাত্মা গান্ধীর নাম উল্লিখিত হইল—তাঁহাকে সামরিকপদক দানে সম্মানিত করা হইল। জোহান্সবার্গ নগরে মৃত ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণের জন্য একটা স্মৃতিমন্দির প্রস্তুত হইল। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ এবার বুঝিলেন যে, কর্ত্তব্যের বোঝা ঘাড়ে পড়িলে ভারতীয়েরা তাহা সম্পাদনে পশ্চাৎপদ হয় না। ট্রান্স্‌ভালে ভারতীয়গণের প্রতি অত্যাচারের ফলেই যে এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা ঘোষণা করিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর কার্য্য শেষ হইল। তিনি এবার স্ত্রীপুত্রাদিসহ দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। নেটালের ভারতীয়গণ একটা বিদায় ভোজে মহাত্মাজীকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিলেন,—তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সন্তানদিগকে রত্নালঙ্কার ও স্বর্ণপাত্র উপহার দেওয়া হইল। ত্যাগী মহাত্মা উহা গ্রহণ না করিয়া, সেগুলি তথাকার জনহিতকর কার্য্যের জন্য উপহারদাতাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। এহেন পরার্থপরতা ও নির্লোভের জন্যই তিনি মহাত্মার শ্রেষ্ঠতম আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

সরকারী ঘোষণাদি দ্বারা ভারতীয়গণের বিশ্বাস হইল যে, এবার তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার হইবে সুতরাং দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচিবে। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাই নগরে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়; মহাত্মা গান্ধী তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাসমিতির অধিবেশনের পর তিনি বোম্বাই ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে তিনি নেটাল হইতে একটা জরুরী তারের খবর পাইলেন। নেটালস্থিত ভারতবাসীরা তাঁহাকে অবিলম্বে তথায় যাইবার জন্য তার করিয়াছে, কেননা উপনিবেশ-সচিব মিঃ যোসেফ চেম্বারলেন শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন। তাঁহাকে উপনিবেশবাসী ভরতীয়গণের অবস্থা জ্ঞাপন করা আবশ্যক; মহাত্মাজী ছাড়া সে কার্য্য অন্যের দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। এই তার পাইয়া তিনি অবিলম্বে নেটালে চলিয়া গেলেন।

নেটালে পৌঁছিয়াই তিনি ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে স্বয়ং মুখপাত্র হইয়া—একদল প্রতিনিধি লইয়া ঔপনিবেশিক সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন —ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগের কথা বুঝাইয়া দিলেন। নেটালবাসী শ্বেতাঙ্গগণ—বিশেষতঃ সরকারী কর্ম্মচারিগণ গান্ধীর গুণের

পরিচয় তো বিশেষ ভাবেই পাইয়াছিলেন; সুতরাং উপনিবেশসচিবের সাক্ষাতের জন্য সরকারের সম্মতি পাইতে তাঁহার কোনই বেগ পাইতে হইল না।

১৯০২ সনের মে মাসে বুয়র ও ইংরেজে সন্ধি হইল, বুয়রগণের উপনিবেশ ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রীষ্টেট্ ইংরেজের দখলে আসিল, তথায় বৃটিশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভারতবাসীদিগের অদৃষ্ট যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে ঘোষণাও করা হইয়াছিল যে, ভারতীয়দিগের প্রতি অত্যাচারের ফলেই বুয়র যুদ্ধ উপস্থিত করিতে হইয়াছিল; তবু কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পরেও ভারতবাসীদিগের পক্ষে সেখানে কোনই সুবিধা করা হয় নাই—বরং যথেষ্ট কড়াকড়ি ব্যবস্থাই হইয়াছে। ট্রান্সভালে যাহাতে ভারতবাসীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি না হইতে পারে, সেজন্য তথায় "এসিয়াটিক ডিপার্টমেণ্ট" বা এশিয়া-সংক্রান্ত-বিভাগ নামে একটা নূতন বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

বহুকাল যাবৎ যে-সকল ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূসম্পত্তি কিনিয়া ট্রান্সভালে বাস করিতেছিল, যুদ্ধের সময় তাহারা বৃটিশ-বন্দরে যাইয়া নিরাপদে বাস করিতেছিল। এক্ষণে ট্রান্সভাল বৃটিশের অধিকারে আসিলেও ছাড়পত্র ছাড়া সেই সকল ভারতবাসীদিগকে পুনরায় ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। অনেক চেষ্টার পর তাহারা অনেকে নিজে ছাড়পত্র পাইলেও স্ত্রীপুত্র পরিজন বা কর্ম্মচারীদিগের জন্য ছাড়পত্র পাইল না, সুতরাং তাহাদিগকে ট্রান্সভালে লইয়া যাওয়া দায় হইল। নূতন ব্যবস্থায় তথায় যে কোন স্থানে ব্যবসায় করা দায় হইল, তাহারা নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল, নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরে ছাড়া সম্পত্তি কিনিবার অধিকার হারাইল, নূতন ব্যবসায়ী বা যাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে,

তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ৪৫৲ টাকা হিসাবে সেলামী দিতে হইল ; এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নিয়মে তাহাদিগকে ফাঁদে আট্‌কাইয়া রাথার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের যে সকল অভাব ও দুর্দ্দশার ব্যাপার আছে উপনিবেশসচিবের নিকট তাহা জানাইবার জন্য চেষ্টা হইল। কিন্তু সেখানকার সরকারী আমলারা মহাত্মা গান্ধীকে প্রতিনিধি-মণ্ডলীতে স্থান দিতে রাজি হইলেন না। বরং মহাত্মাজী অনেক চেষ্টায় উপনিবেশ সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর কথা কাণেই তুলিলেন না ; বরং তাঁহাকে মাঝখানে আনার জন্য ভারতীয়গণের উপর খুব চোখ রাঙ্গানি চলিল। ভারতীয়েরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া ডেপুটেসন পাঠাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাহা হইতে দিলেন না—চোরের সঙ্গে রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, তাহা বুঝাইয়া সকলকে উপনিবেশসচিবের নিকট সাক্ষাৎকারের জন্য পাঠাইলেন।

জোহান্সবার্গে একটা নূতন বাজার বসাইবার প্রস্তাব হয়। তদুপলক্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মিউনিসিপাল সমিতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। সমিতির কর্ত্তারা এই দলের লোকদিগের তালিকা হইতে মহাত্মা গান্ধীর নাম কাটিয়া দিলেন—ভারতীয়েরা সুতরাং কর্ত্তাদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইল না। শেষে মিউনিসিপাল সমিতি আবার সেই তালিকায় মহাত্মা গান্ধীর নাম বসাইয়া দিলেন। ইহা হইতেও কর্ত্তাদের মত বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল—ব্যাপার যে ক্রমেই গুরুতর হইতেছে, তাহা সকলেই উত্তমরূপে বুঝিতে পাইল, সুতরাং ভাবী সঙ্কটকালে যাহাতে নেতার অভাব না হয়, সেজন্য সকলে মহাত্মা গান্ধীকে তথায় থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। মহাত্মা এই

অনুরোধ রক্ষা করিলেন, তিনি ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ার সুপ্রেম-কোর্টে ব্যবসায় করিবার অনুমতি লইলেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রিটোরিয়ার সুপ্রিম কোর্টে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এদিকে তাঁহার মনে হইল যে, একতাবদ্ধ দল যত ছোটই হউক না কেন, তাহারই একটা ক্ষমতা আছে। তিনি সেই ক্ষমতালাভের জন্য ট্রান্স-ভালের ভারতীয়দিগকে একতাবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন। সেইজন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে একটা সভাস্থাপন করিলেন, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের নেতারা সভার সভ্য হইলেন। সভার নাম রাখা হইল "ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন"; মহাত্মা গান্ধী এই সভার সম্পাদক ও আইন ঘটিত পরামর্শদাতা হইলেন। পরম উৎসাহে—বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সভার কার্য্য চলিতে লাগিল।

সভাস্থাপনদ্বারা ভারতবাসীরা একতাবদ্ধ হইতে পারিবে বটে, তাহাতেইতো আর তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর হইবে না, স্বার্থও রক্ষা পাইবে না। উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় যাহাতে ভারতবাসী-দিগকে জানিতে চিনিতে পারে, সে জন্য মহাত্মার বিশেষ চেষ্টা হইল। সংবাদপত্র ব্যতীত ঐকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া, তিনি সেই বছরই একখানা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য উহা ইংরাজী, গুজরাটী, হিন্দী ও তামিল এই চারি ভাষায় প্রচারিত হইতে লাগিল। পত্রিকার নাম হইল "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন"। পত্রিকার সম্পাদক হইলেন শ্রীযুক্ত নীজার। ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কর্ম্মিপুরুষ। দুই বছর সম্পাদকতা করিবার পর এই উদ্যমশীল যুবক পরলোক গমন করেন। তখন মহাত্মা গান্ধীর সহযোগী ও সম-মতাবলম্বী নেটালের ব্যারিষ্টার মিঃ পোলাক উহার সম্পাদক হন।

জনকোলাহল এবং উদ্দামতার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া মহাত্মা গান্ধীর চিত্ত যেন বিকল—বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি নিভৃত-নিবাসে বাস করিয়া নিজের কল্পনা ও ভাব সফল করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। দরবান বন্দরের প্রায় বার মাইল দূরে ফিনিক্স গ্রামে একটা স্থান আছে। স্থানটী পর্ব্বতের উপত্যকায় অবস্থিত, বিশাল ইক্ষু-ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, অল্প দূরেই রেলপথ ও ষ্টেসন অবস্থিত। মহাত্মা গান্ধীর এই স্থানটী বড় মনোমত হইল, তিনি ঐ স্থানে তিন শত বিঘা ভূমি কিনিলেন। সেখানে বাস করিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গ পরিবারকে লইয়া গেলেন। তাঁহারা যে পল্লীর প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার নাম দিলেন "ফিনিক্স সেট্‌লমেণ্ট।" এখানে মহাত্মা গান্ধীর নিজের জন্য বাড়ী হইল, ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়নের জন্য পৃথক্ বাড়ী হইল, অল্প দিনের মধ্যেই নূতন নূতন গৃহস্থ আসিয়া স্থানটী ভরিয়া ফেলিল।

এই পল্লীপ্রতিষ্ঠা ও তথাকার অধিবাসীদিগের তথায় বসতি করিবার জন্য যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাকালীন আর্য্য ঋষিদিগের তপোবনের সাম্য ও শান্তিময় চিত্র যেন মহাত্মা গান্ধীর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল। জগতের হিংসা, দ্বেষ, আলস্য ও ভেদবুদ্ধি দূর করিবার জন্য তিনি যেন বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

এই ফিনিক্স পল্লীতে যাহারা বাস করিবে তাহারা এই সকল সর্ত্তে বাধ্য থাকিবে;—(১) ছাপাখানা, পত্রিকা ও ভূসম্পত্তিতে তাহাদের ষোল আনা অধিকার থাকিবে। (২) প্রত্যেক অধিবাসীকে সামান্য দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে। (৩) কেহই মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকার বেশী অর্থ লইতে পারিবেন না; ঐ টাকায়ই জীবিকা-বায় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। (৪) যৌথ ব্যবসায় ও সম্পত্তি হইতে

যদি লাভ হয়, তবে অধিবাসীরা তাহাতে সমান অংশী হইবে। (৫) নবাগত গৃহস্থের বাড়ী ঘর সাধারণ ধনভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, কিন্তু সেই অর্থ—তিনি যতদিনে পারেন—ক্রমে ক্রমে শোধ করিবেন, এই টাকার জন্য তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে না। (৬) প্রত্যেক গৃহস্থ নিজে চাষ করিবার জন্য ছয় বিঘা করিয়া জমী পাইবেন, এই জমীর বাবদ যে টাকা দিতে হইবে, তাহাও ক্রমে ক্রমে দিতে হইবে। (৭) এই পল্লীর গৃহস্থগণের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না, সকলকেই সাধারণের হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ থাকিবেন।

ফিনিক্স পল্লীতে বাড়ী করিয়াছিলেন, কাজেই মহাত্মা গান্ধী নিজেও ঐ সকল চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন; এবং চাষের কাজ তাঁহাকেও করিতে হইত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শিষ্যদিগের কাছে আদর্শ স্থাপন করিতেন, শুধু কতকগুলি উপদেশ বাক্য বলিয়া যাইতেন না; মহাত্মা গান্ধী সেই ঋষিপন্থী। তিনি উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিয়া দশজনকে শিক্ষা দান করেন—তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী দিনের কার্য্যেই এই দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় মনে করেন; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তিনি অতিমাত্র দূরদর্শী—কর্ম্মী। সংযম, ত্যাগ ও পরার্থপরতার সাধক না হইলে, মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য বুঝা যায় না।

ভারতীয়দিগের মধ্যে রাজনীতিক ও সামাজিক শিক্ষার বিস্তারের জন্যই তিনি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্য উহা গুজরাটী, হিন্দী ও তামিল ভাষায় মুদ্রিত হইত। কেননা ঐ সকল ভাষাভাষী ভারতীয় লোকেরাই দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাস করিত। মাহত্মা গান্ধী উহাদের জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন, তাহারা কিন্তু

পত্রিকার মর্য্যাদা তেমন ভাবে বুঝিল না। এজন্য তিনি হিন্দী ও তামিল ভাষায় উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। এই পত্রিকা প্রচারে প্রথম বছরে তাঁহাকে নিজের তহবিল হইতে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, এই পত্রিকায় তিনি এমন ভাবে ভারতীয়গণের স্বার্থের বিষয় প্রবল যুক্তির সহিত প্রচার করিতেন যে, তাহাদ্বারা ভারতীয়-গণের মধ্যে যেমন আত্মরক্ষার একটা ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তেমনি প্রতিপক্ষ ও শ্বেতাঙ্গগণের সমুদয় কূটকৌশল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শত্রুমিত্র সকলেই এই পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ফিনিক্স উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তিনি যে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, সংযম, স্বার্থত্যাগ ও কর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাহার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। ভাবপ্রবণতা বা কল্পনাপ্রিয়তার বশেই শুধু তিনি উহা করেন নাই—যাহারা কখনো সেই পল্লীতে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারাই দেখিয়াছে যে, পল্লীর প্রত্যেক ব্যক্তি—কি শ্বেতাঙ্গ কি কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই—কর্ম্মে ব্যস্ত। কেহ ভূমি চাষ করিতেছে, কেহ মাটি খুঁড়িতেছে, কেহ বীজ বুনিতেছে, চারা রোপণ করিতেছে—কেহবা ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি গৃহে লইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই চাষবাস করিতেছেন, তাঁহারা একজনও নিরক্ষর নহেন, সকলেই শিক্ষিত—ভদ্র সন্তান। ইঁহারা প্রত্যেকে আহার বিহার সাজসজ্জা ভৃতি সকল বিষয়ে কঠোর সংযম অবলম্বন করিলেন। পল্লীর সকলকে যিনি এরূপভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করিতে পারেন, তিনি কি কেবলই ভাবপ্রবণ ও কল্পনা প্রিয়?

মহাত্মা গান্ধী গীতার উপাসক, ইহা তাঁহার পৈতৃক অধিকার বলিলেও অন্যায় হয় না। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেই শুধু তোমার অধিকার, ফলে তোমার কখনো অধিকার নাই। প্রকৃত কথা

এই যে, কোনরূপ ফল পাইবার আশা না করিয়া—কর্ত্তব্যবোধে কাজ করিয়া যাইবে। মহাত্মা গান্ধীও স্বয়ং ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সকল প্রকার কাজ করিয়া থাকেন। সুতরাং কি রাজদরবারে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তরোগীর সেবায়—কোথাও তাঁহার মনে কোন ভয় বা সঙ্কোচ আসে না, নিন্দা প্রশংসাকেও তিনি কদাপি গ্রাহ্য করেন না। এই অনন্যসাধারণ শক্তির কাছেই মানুষ মাথা নোয়াইয়াছে—তাঁহার আদেশ দেবতার আদেশের মত অবিচারিতচিত্তে মানিয়া লইতেছে।

ক্রমান্বয়ে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় বৃষ্টি হওয়াতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জোহান্স্‌বার্গে ভয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দিল। ভারতীয়েরাই ইহাতে অতিশয় সাংঘাতিকরূপে আক্রান্ত হইল। মহাত্মা গান্ধী সংবাদ পাইবামাত্রই জোহান্স্‌বার্গে ছুটিয়া আসিলেন। এদিকে স্থানীয় কর্ত্তাদের কিন্তু মোটেই চৈতন্য নাই। তিনি মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তাদিগকে ব্যাপার জানাইয়া অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন, নতুবা ভবিষ্যতে সে ব্যাধি ভীষণ আকার ধারণ করিবে তাহাও জানাইলেন। প্রভুরা কিন্তু অচেতনই রহিলেন, কোন উত্তর দেওয়ার দরকারও মনে করিলেন না।

এদিকে একদিনের মধ্যেই তেইশজন রোগাক্রান্ত ভারতীয়ের মধ্যে একুশজন লোকই মরিয়া গেল। পরার্থপর মহাত্মা তখন আর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিলেন না—স্বয়ং বিপন্নদিগের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। সুতরাং এক্ষণেও তিনি স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তার মিঃ পেককে এই সংবাদ দিলেন এবং একজন ইন্‌স্পেক্টর সঙ্গে লইয়া রোগাক্রান্ত স্থানে গেলেন। সঙ্গে ৪।৫টী স্বেচ্ছাসেবক মাত্র চলিল।

জনৈক ভারতবাসীর একখানা খালি দোকানঘর ছিল, তিনি সঙ্গীদিগকে লইয়া সেই ঘরখানা খুলিলেন—নানাস্থান হইতে প্লেগের রোগী

আনিয়া দোকানটী হাসপাতাল করিয়া তুলিলেন। গড্‌ফ্রেনামক জনৈক ডাক্তার আসিয়া এই দলে যোগ দিলেন। সকলে প্রাণপণে রোগীদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সে দিনও রাত্রি কাহারো ভাগ্যে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম ঘটিল না। পরদিন মিউনিসিপাল কর্ত্তাদের ঘুম ভাঙ্গিল! তাঁহারা আসিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিলেন—বহুৎ জয়গান করিলেন! 'এ ব্যাপারে গান্ধী প্রয়োজন মত টাকা খরচ করিতে পারেন —সে টাকা মিউনিসিপালিটী দিবেন' বলিয়া স্বীকার পাইলেন।

ক্রমে রোগের আক্রমণ বাড়িল—রোগীর সংখ্যাও বাড়িল। কয়েক জন মাত্র লোকের পক্ষে এতগুলি রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন। ভারতীয়েরা একটা সভা করিয়া চাঁদা তুলিলেন—দোকানীরা আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে লাগিলেন। গান্ধী কিন্তু নির্ভয়চিত্তে—সঙ্গীদিগকে উৎসাহ উদ্দীপনায় জাগাইয়া—রোগীর শুশ্রূষায় লাগিয়া রহিলেন।

একদিন পর মিউনিসিপালিটী একটা পুরাণ দালান ছাড়িয়া দিলেন, ভারতীয়েরা প্রাণপাত চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ীটা ঝাড়িয়া পুছিয়া রোগীদিগের বাসের যোগ্য করিয়া লইল। একজন ধাত্রী ও ডাক্তার আসিলেন। কিন্তু রোগীদিগের মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পড়িতে লাগিল। শেষে তাহাদিগকে অন্য দুইটা স্থানে সরাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল—ক্লিপসপ্রুট্ নামক স্থানে মহাত্মা গান্ধী ও ডাক্তার গড্‌ফে একটা তাঁবু ফেলিয়াছিলেন—তথায়ও কতক রোগী সরাইয়া লওয়া হইল। মহাত্মাজীর কর্ম্মে ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া এই দারুণ মহামারীর সময় মিঃ এল্ ডব্লু রিচ্ নামক জনৈক ইংরেজ প্রাণপাত পরিশ্রমে রোগীসেবা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি ভারতবাসীদের জন্য পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

এত চেষ্টা—এত পরিশ্রমেও একমাসের মধ্যে রোগের প্রকোপ কমে নাই। এই ব্যাপারে ২৫ জন শ্বেতাঙ্গ, ৫৫ জন ভারতবাসী, ২৯ জন দেশীয় ও ৪ জন অন্যান্যদেশীয় লোকের প্রাণ গিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী যদি ঠিক সময়ে অগ্রসর না হইতেন, তবে জোহান্স্‌বার্গে যে মরণের মহোৎসব লাগিয়া যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহার পর একবছর যাইতে না যাইতেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল, নেটালে যুদ্ধসজ্জার ধূম পড়িয়া গেল। এবার জুলুরাজ্যের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইল। ভারতীয়েরা যে কেবল সুখের কালেই ভাগ চাহে—দুঃখের ভাগ লইতে রাজি নহে এবং তাহারা যে যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদ্ মাথা পাতিয়া লইবার সাহস রাখে—সে কথার প্রমাণ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী এবারও স্বয়ং অগ্রসর হইয়া একটা স্বেচ্ছাসেবক-দল গঠিত করিলেন। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহতদিগকে ডুলিতে করিয়া হাসপাতালে আনিবার জন্য প্রার্থী হইল। কর্ত্তৃপক্ষ প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

এই সেবকদলের সেবক, সংখ্যায় কুড়িজন মাত্র—মহাত্মা গান্ধী ইহাদের পরিচালক। যথাকালে এই দল, অশ্বারোহী সৈন্যগণের পেছনে পেছনে পদব্রজে যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিল। সেই অসভ্যগণের অধ্যুষিত দেশের নদনদী-অরণ্য-কান্তার অতিক্রম করিয়া নিরস্ত্র ভারতীয়গণ প্রতিদিন ২৫।৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। অশ্বারোহী দলের কর্ত্তা এই সেবক-দলের কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

প্রায় একমাস সময় ইহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে হইল। আহত জুলুদিগের শুশ্রূষার ভার এই ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদলের উপরও প্রদত্ত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকারী সেবকগণ নির্ব্বিকার-

চিত্তে, অক্লান্তভাবে আহতগণের সেবা করিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সেবকদলকে ধন্যবাদ দিলেন, সরকারী বিবরণে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণের অপূর্ব্ব কার্য্যকুশলতার বিবরণ প্রকাশিত হইল। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল হইল, তিনি কার্য্যদ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে, ভারতীয়েরা কার্য্যক্ষেত্রে কোন বিষয়েই শ্বেতাঙ্গগণের চেয়ে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নহে। সুযোগ পাইলেই তাহারা শ্বেতাঙ্গগণের সহিত তুল্যরূপে সকল কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে পারে।

ট্রান্সভাল অধিকারের পর তথায় ইংরেজের কর্তৃত্বে নূতন শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এসিয়ার লোকেরা যাহাতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য এখানকার শ্বেতাঙ্গেরা সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত। জুলুবিদ্রোহের পর তাহারা ট্রান্সভালে একটা নূতন আইন প্রচার করিল। সেই আইন অনুসারে এসিয়ার লোকদিগকে স্ত্রীপুরুষ, ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে একটা সরকারী খাতায় নাম রেজিষ্টারী করিয়া সহি করিতে এবং টিপ্‌সহি দিতে হইবে। এরূপ আইন যে কতদূর অপমানজনক তাহা সহজেই বুঝা যায়। মহাত্মা গান্ধী এহেন অবমাননাকর আইন মানিয়া অসম্মানের বোঝা বহিতে রাজি হইলেন না। তিনি এসিয়া-বাসীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণে অগ্রসর হইলেন। মহাত্মা গান্ধী বুঝিয়াছিলেন যে, ট্রান্সভালের এই আইন যদি ভারতীয়েরা গ্রহণ করে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশেতো নিশ্চিতই—পৃথিবীর স্বাধীনরাজ্যসমূহেও—পরাধীন ভারতীয়গণের জন্য ঈদৃশ আইন রচিত হইবে। সুতরাং এরূপ আইন যাহাতে প্রবর্ত্তিত হইতে না পারে, সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী জোহান্সবার্গে ফিরিয়া আসিয়াই ভারতীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। পরে যাহাদের

উপর আইন রচনার ভার, তাহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ দেখা করিতে রাজি হইলেন, মহাত্মা গান্ধী বহু যুক্তি ও তর্ক বিতর্ক দ্বারা এই আইনের দোষগুলি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন। অনেক বাদপ্রতিবাদের পর কর্ত্তারা শুধু এসিয়াবাসী স্ত্রীলোক দিগকে আইনের আমল হইতে রেহাই দিতে রাজি হইলেন।

'নাই মামার চেয়ে কাণামামা ভাল' হইলেও মহাত্মা গান্ধী আইনের এইটুকু পরিবর্ত্তনেই নিরস্ত হইলেন না। কেননা ইহাতে যদিও স্ত্রীলোকের উপর হইতে অত্যাচারের সম্ভাবনা কমিল, কিন্তু অন্য সকলের বিপদ্ ও অসম্মান সমভাবেই বজায় রহিল। সুতরাং তিনি সভা করিয়া এবং সংবাদপত্রে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিয়া এই বিষয়ে দারুণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। ভারতীয়গণ সর্ব্বত্র এই আন্দোলনে যোগ দিল—বিরুদ্ধে মত দিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই আন্দোলনে কাণ দিলেন না—আইন পাশ করিলেন।

ট্রান্সভালে এম্পায়ার থিয়েটার নামে একটা নাটক ঘর আছে। যেদিন এই আইন পাশ হয়, সেই দিনই ভারতীয়েরা ঐ নাটক ঘরে একটা বিরাট্ সভায় এই আইনের প্রতিবাদ করিলেন এবং সকলে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কোন মতেই তাহারা নাম রেজিষ্টারী করিবেন না ; এজন্য যত রকমের দুঃখ কষ্ট বা নির্য্যাতন আসুক না কেন তাহা সকলে নিরাপত্তিতে সহিয়া লইবেন। কোন প্রকার বাধা না দিয়া—অত্যাচার অনাচার সহিয়া লইয়া—উহাকে দূর করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার নাম—"প্যাসিভ্ রেজিষ্ট্যান্স্ বা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ।" মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতায় ভারতীয়গণ ১৯০৬ খৃঃ অব্দের ১১ই সেপ্টম্বর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভারতবাসীর পক্ষে উহা একটা স্মরণীয় দিন।

অতঃপর মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ আলী ভারতীয়গণের প্রতিনিধি হইয়া

এই আইনের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গেলেন। শীঘ্রই ট্রান্সভালে দায়িত্বমূলক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে—সেই গভর্ণমেণ্ট এই আইনের বিষয় মীনাংসা করিবেন বলিয়া আপাততঃ এই আইন স্থগিত রহিল।

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃপক্ষের মতিগতি বেশ ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং বিলাতের এই ব্যবস্থায়ই তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। বিলাতে এ বিষয়ের আন্দোলন জাগাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে একটা সমিতি গঠিত হইল। ভারতের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী বড়লাট—মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড এম্প্থিল্ ঐ সভার সভাপতি এবং স্যার মাঞ্চেরজী ভবনগরী উহার কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন। আয়োজন অনেক হইল বটে, কিন্তু ট্রান্সভালে দায়িত্বমূলক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আইন সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া গেল (১৯০৭ খৃঃ অঃ জুলাই)।

মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন—ভারতীয়দিগকেও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পরামর্শ, সভা সমিতিতে বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতীয়গণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন। ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিজ্ঞা করিল—"মরিব, তবু আত্মসম্মান ডালি দিব না।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় এক হাজার চীনা বাস করিত। এশিয়াবাসী বলিয়া তাহারাও এই আইনের আমলে পড়িয়াছিল। ভারতীয়দিগকে এভাবে সংঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া তাহারাও মিঃ লিয়ং কুইন্ নামক একজন চীনাকে নেতা করিয়া ভারতবাসীর পাশে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল। তাহারাও বলিল—"আমরাও নাম রেজিষ্টারী করিব না—সরকারী খাতায় সহি দিব না।"

ভারতীয়েরা ইংলণ্ডের অধীন—আবার ট্রান্সভালে ইংলণ্ডেরই অধিকার; সুতরাং ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিতে

উপনিবেশী শ্বেতাঙ্গগণের কোন ভাবনাই হয় না। কাজেই রেজিষ্টারী আইনটা আগে ভারতবাসীর উপরই চালাইবার ব্যবস্থা হইল। কর্ত্তারা অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু একজন ভারতবাসীকে দিয়াও নাম রেজিষ্টারী করাইতে পারিলেন না। আইন না মানিলে তাহার ছয় মাস জেল হইবে বলিয়া নিয়ম ছিল। কাজেই আইন অমান্য করার জন্য ভারতীয়-দিগকে ধরিয়া জেলে দেওয়া হইতে লাগিল। তাহারাও নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জেল পূর্ণ করিয়া তুলিল।

ক্রমে মহাত্মা গান্ধীও আইন অমান্য করার অপরাধে ধৃত হইলেন। সত্যসেবক, নির্ভীক মহাত্মা বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি প্রার্থনা করিলেন। কেননা তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে—'ভারতবাসীদিগকে আমিই নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ মন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করিয়াছি; কাজেই আইন অনুসারে আমাকেই অধিকতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।'

কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর সহকারীদিগের মধ্যে কয়েকজনও প্রিটোরিয়া নগরে আইনভঙ্গের জন্য ছয় মাস কারাদণ্ড পাইয়াছিলেন—মহাত্মা গান্ধীও সকলের সহিত সমান শাস্তি পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু বিচারক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহাত্মাজীকে বিনাশ্রমে দুই মাস কারাদণ্ড দিলেন। তিনিও হাসিমুখে সঙ্গীদিগের সহিত জেলে যাইয়া মিলিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ধৃত হইবার আগেই খবর পাইলেন যে, তাঁহার ছোট ছেলেটী মরণাপন্ন; তাহাকে শেষ দেখা দেখিতে হইলে ফিনিক্স উপনিবেশে যাওয়া আবশ্যক। মহাত্মাজী ইহা শুনিয়া অবিচলিতভাবে দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—"পুত্রের চেয়ে জাতি আমার বড়—আমার স্বজাতীয়েরা জোহান্সবার্গে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং আমি তথায়

চলিলাম। পুত্রের ভার ভগবানের উপর রহিল।" একনিষ্ঠ সাধকের প্রার্থনাবাক্য সত্য হইল—পুত্রটীকে ভগবান বাঁচাইয়া রাখিলেন।

গবর্ণমেণ্ট যতই কঠোরতা অবলম্বন করিলেন—দলে দলে ভারতীয়-দিগকে ধরিয়া—স্ত্রী-পুরুষ, ধনি-নির্দ্ধন, বিদ্বান-মূর্খ নির্ব্বিশেষে জেলে পাঠাইতে লাগিলেন, ভারতবাসীদিগের দৃঢ়তা ও উদ্দীপনা ততই বাড়িতে লাগিল—আন্দোলন চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল ; অথচ মহাত্মাজীর শিক্ষাগুণে কোনরূপ হাঙ্গামা ঘটিল না।

কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন—কতকগুলি লোক ধরিয়া জেলেপূরিলেই অবশিষ্ট সকলে ভয়ে ভয়ে আইন মান্য করিবে। যখন তাঁহাদের সে ধারণা ভুল বলিয়া ধরা পড়িল, তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে, বুদ্ধির গ'লে—সকল গোলযোগের মূল—গান্ধীকে ধরিয়া জেলে দিলেই লোকগুলি সোজা হইয়া যাইবে। কিন্তু এ কল্পনাও নিমেষে অতিমাত্র মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। কোন কিছুতেই ভারতীয়েরা আইন মানিতে রাজি হইল না দেখিয়া, এবার কর্ত্তারা ভাবনায় পড়িলেন। কিন্তু অবিলম্বে রাজ-নীতি অবলম্বন করা হইল।

রাজনীতি শব্দের যথার্থ অর্থ কপটতা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার—উহাকে সত্যের আবরণে মিথ্যার অবতারণাও বলা যায়। ট্রান্স্‌ভাল লীডার নামে একখানা সংবাদপত্র আছে, উহার সম্পাদকের নাম মিঃ কার্টরাইট্। কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পাদককে মহাত্মা গান্ধীর কাছে পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, "তিন মাসের মধ্যে রেজিষ্টারী আইন অনুসারে কোন কাজ হইবে না। এই তিন মাসের মধ্যে ভারতীয়েরা যদি স্বেচ্ছায় নাম লেখাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ঐ আইন পরে রদ করিয়া দেওয়া হইবে।"

এদিকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জেনারেল স্মট্ কারাগারে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ প্রস্তাবই করিলেন। তিনি শুধু

প্রস্তাব নহে, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার পাইলেন যে, "যদি ভারতবাসীরা স্বেচ্ছায় নাম লেখাইয়া দেয় তাহা হইলেই আইনটা একেবারে রদ করিয়া দেওয়া হইবে।" সত্যপরায়ণ, সুরলহৃদয় মহাত্মা গান্ধী জেনারেল স্মটের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জেনারেলের প্রস্তাবে রাজি হইলেন, সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিলেও মহাত্মা গান্ধী টলিলেন না। কেহ কেহ এই ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন—এমন কি তাঁহাকে সরকারী গোয়েন্দা ভাবিলেন।

মহাত্মা গান্ধী তখন সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা সকলকে জানাইয়া স্বয়ং নাম লেখাইতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি যখন নাম লেখাইবার জন্য রেজিষ্টারী আফিসে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে একজন পাঠান পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিল। প্রহারের ফলে মহাত্মার নাক মুখ দিয়া অজস্রধারায় রক্তপাত হইতে লাগিল—তিনি অজ্ঞান অচেতন হইয়া রাজপথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

দুর্দ্দান্ত পাঠান যখন মহাত্মা গান্ধীকে প্রহার করে, তখন দর্শকেরা পাঠানকে দণ্ড দিবার জন্য অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপার বুঝিয়া মহাত্মাজী তৎক্ষণাৎ কহিলেন,—"কেহ যেন এই পাঠানের গায়ে হাত না তোলেন, তুলিলে সে আঘাত আমার গায়েই পড়িবে। কেন না এই পাঠান স্বজাতি-প্রীতির বশেই আমার প্রতি এই ব্যবহার করিয়াছে।" এক বিন্দু তৈল পড়িলে যেমন দুগ্ধের প্রবল উচ্ছ্বাস তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়, ক্ষমাশীল মহাত্মার একটীমাত্র কথায়-তেমনি উন্মত্তজনতা চঞ্চলতা ত্যাগ করিল। তাহারা বিস্মিত হইয়া এই মহাত্মার দেবচরিত্রের কথাই ভাবিতে লাগিল।

যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিল তাহার কাছেই রেভারেণ্ড মিঃ জে. জে.

ডোকের বাস-গৃহ। এই সদাশয় খৃষ্টীয় যাজক মহাত্মা গান্ধীকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন—মহাত্মার গুণে বড়ই মুগ্ধ ছিলেন। কয়েকজন লোক তাড়াতাড়ি রক্তাক্তদেহ মহাত্মা গান্ধীকে ধরাধরি করিয়া এই পাদরীর বাড়ীতে তুলিয়া লইল। সাহেব তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনাইলেন। ডাক্তার আসিয়া ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিলেন। তখনো সেলাই করা স্থানে ঔষধ দেওয়া হয় নাই—গান্ধী কিন্তু কাহারো নিষেধ না মানিয়া ঐ অবস্থায়ই রেজিষ্টরী আফিসে গেলেন, নাম লিখাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

মহাত্মা গান্ধী যখন আফিসে নাম রেজেষ্ট্রী করিতেছিলেন, তখনো তাঁহার প্রহারজর্জ্জরিত ক্ষত স্থান হইতে রক্তপাত হইতেছিল। আফিস হইতে ফিরিয়া সেই দিন বিকালেই তিনি একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। কেননা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপার উপলক্ষে ভারতীয়গণের মধ্যে একটা দলাদলি হইতে পারে—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। যদি সেরূপ হয়—তবে সেই একতা-নাশের ফলে ভারতীয়গণ যে লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতেছিলেন—সে লক্ষ্য একেবারে ধ্বংস পাইবে। যাহাতে সেইরূপ ঘটনা ঘটিতে না পারে, সেজন্য প্রহারযাতনায় শয্যাশায়ী থাকিয়াও তিনি তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বিরত হইলেন না।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ঘোষণায় বলিলেন,—"যাহারা আমাকে মারিয়াছে, তাহারা জানিত না যে, কেন আমাকে মারিতেছে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আমি অন্যায় করিয়াছি; তাই তাহারা প্রতিকারের এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল। কাজেই তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা হয় তাহা আমি ইচ্ছা করি না।

"এ ব্যাপারে হিন্দুরা হয়ত ক্ষুব্ধ হইবেন—একজন মুসলমান আমার গায়ে হাত তুলিয়াছে ভাবিয়া খুব অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। এরূপ করিলে

তাঁহারা ভগবানের দৃষ্টিতে ও বিশ্ববাসীর কাছে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন। আজ যে শোণিতপাত হইয়াছে, তাহার ফলে হিন্দুমুসলমানের প্রীতির বন্ধন যেন অচ্ছেদ্য ও দৃঢ়তর ভাবে আবদ্ধ হয়। ইহাই ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

"ভারতবাসীরা যখন নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবেন, তখন একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কাহারো ভয়ে তাঁহারা ভীত হইবেন না। সংযমশীল ভারতবাসীরা যখন ঐ নীতির আশ্রয় লইবেন, তখন আর তাঁহারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না। তাঁহারা স্বেচ্ছায় নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলে, নূতন আইন রহিত করিয়া দিবেন বলিয়া সরকারপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয়গণের পক্ষে গভর্ণমেণ্টের মতানুসারে চলাই কর্ত্তব্য।"

মহাত্মার ঘোষণাবাণী সফল হইল, ভারতীয়েরা দলে দলে যাইয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিতে লাগিল। যাহারা নাম রেজিষ্টারী করিল, তাহারা এক এক খানা সার্টিফিকেট পাইল।

এদিকে প্রহারের ফলে মহাত্মা গান্ধী একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই মনে করিতে লাগিলেন যে, এবার বুঝি মহাত্মাজীকে বাঁচাইয়া তোলা অসম্ভব হইল! উদারহৃদয় মিঃ ডোকের করুণাময়ী সহধর্ম্মিণী দিনরাত্রি রোগীর শয্যায় উপস্থিত থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ভগবান এ যাত্রা মহাত্মাজীকে নিরাময় করিয়া তুলিলেন।

তিন মাস অতীত হইল, কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতিপালনের সময় আসিল। কিন্তু তাঁহারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অর্থাৎ আইন তুলিয়া দিতে রাজি হইলেন না! এ ব্যাপারে সরলপ্রাণ গান্ধীর হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। তিনি বহুবার লাটদরবারে যাইয়া জেনারেল স্মটের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করিয়া কত অনুরোধ উপরোধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনই

ফল হইল না। সত্যের আবরণে মিথ্যা ব্যবহার করিয়া কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাজ হাসিল করিয়া লইলেন।

এক্ষণে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন গতি রহিল না। সকলে আবার সেই পথ ধরিয়া আইন ব্যর্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া যে সার্টিফিকেট সকলে পাইয়াছিল, আইন অনুসারে সকলকে উহা কর্তৃপক্ষকে দেখাইতে ও টিপ্‌সহি দিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রাণ গেলেও কেহ উহা দেখাইবে না কিংবা টিপ্‌সহি দিবে না। ভীষণরূপে চারিদিকে বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—চারিদিকে ধরপাকড় চলিল। দলে দলে ভারতীয় নরনারী আইন না মানিবার অপরাধে জেলে যাইতে লাগিল। জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য পত্নী স্বামীছাড়িয়া, স্বামী স্ত্রীপুত্র কন্যা-পরিত্যাগ করিয়া, হাসিমুখে জেলে প্রবেশ করিতে লাগিল। জেলখানা ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত অসংখ্য ভারতীয় নরনারীর তীর্থে পরিণত হইল। যাহারা এভাবে অদৃষ্টকে বরণ করিয়া লইল—তাহাদের আত্মীয়স্বজনগণ অন্নবস্ত্রের অভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কত বড় বড় মহাজন স্বজাতির সম্মান ও সত্যরক্ষার জন্য দীন ভিখারী হইয়া পড়িল। ট্রান্সভালের নয় হাজার ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় তিন হাজার পুরুষ এই ব্যাপারে অম্লানবদনে কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই তিনবারও কারাগারে গেল, তবু কর্ত্তব্যরক্ষায় বা প্রতিজ্ঞাপালনে ক্ষণকালের জন্য উদাসীন হইল না।

কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের মৎলব সিদ্ধির জন্য মিথ্যা দ্বারা লোকগুলিকে ভুলাইলেন, ভারতীয়েরা যখন সেই মৎলব বা মিথ্যা স্বীকার না করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে লাগিল—তখন আবার কর্ত্তারা তদুপরি কঠোর ব্যবহার করিয়া সেই সকল কারাবাসীকে নির্য্যাতন করিতে

লাগিলেন। তন্মধ্যে অখাদ্য কুখাদ্য খাইবার ব্যবস্থাই প্রধান। কিন্তু এততেও—যাহারা সত্যগ্রহণ করিয়াছিল তাহারা দমিল না—সত্য হইতে বিচ্যুত হইল না। ভারতীয় মহিলারাও এ ব্যাপারে প্রাণপণে স্বামি-পুত্র প্রভৃতিকে উৎসাহবাক্যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। ফলে, ক্ষমার বলে অক্ষমা—নিরুপদ্রবের শক্তিতে উপদ্রব—বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী পুনরায় আইন অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত হইলেন। তিনি আত্মসমর্থনের দরখাস্তে লিখিলেন যে,—"একই অপরাধের জন্য আমি আবার বিচারালয়ে আসিয়াছি। আমার এই অপরাধ ইচ্ছাকৃত এবং বিশেষ বিবেচনার পর গৃহীত। এতকালের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদ্বারা আমার চরিত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; শেষে স্থির করিয়াছি যে, যতদিন পর্যান্ত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় নাগরিকগণের বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা না করিবেন—ততদিন আমি বারংবার এইরূপ আইন অমান্য করিবই করিব। এশিয়াবাসীর অবলম্বিত এই প্রতিরোধ-নীতির আমিই প্রবর্ত্তক। এজন্য যদি আমার কার্য্য নিন্দার যোগ্য হয়, তাহা হইলে আমাকেই সকলের চেয়ে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হউক।"

এবারকার বিচারেও মহাত্মা গান্ধীর দুই মাস জেল হইল ; কিন্তু এবার আর অ-শ্রম নহে—স-শ্রম। তিনি ভলক্সরষ্ট্ নামক স্থানের জেলে ছিলেন, সেখান থেকে তাঁহাকে জোহান্স্‌বার্গের দুর্গ-কারাগারে পাঠান হইল। এ সময়ে মহাত্মাজীকে সামান্য কয়েদীর পোষাকে—নিজের লোটা কম্বলের বোঝা ঘাড়ে করিয়া রক্ষীদের সহিত পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু স্বদেশপ্রাণ মহাত্মা ইহাকে আদৌ অপমান বলিয়া মনে করেন নাই।

(৬)

এই সময়ে জেলে থাকিয়াই তিনি একটা তারের খবর পাইয়া জানিলেন যে, তাঁহার জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীর জীবনের আশা নাই। জেলপরিদর্শক

ম্যাজিষ্ট্রেট, মহাত্মাজীকে জরিমানা দিয়া মুক্তিলাভ করিতে এবং এই সময়ে স্ত্রীর কাছে উপস্থিত থাকিতে উপদেশ দিলেন। তিনি কিন্তু কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে স্বীকার পাইলেন না; বরং স্পষ্ট বলিলেন—"ভগবান আমার পত্নীকে রক্ষা করিবেন—আমি হাল ছাড়িলে সব মাটি হইয়া যাইবে।" ইহার পর সরকার তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—তিনিও স্ত্রীর কাছে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আবার গ্রেফ্তার করিলেন। তিনিও মৃত্যুশয্যাশায়িনী স্ত্রীর কাছে বিদায় লইয়া অকম্পিত-পদে গৃহত্যাগ করিলেন—জেলে গেলেন। যাহা হউক, ভগবানের দয়ায় মহাত্মাজীর পত্নী রোগমুক্ত হইলেন।

দুই মাস চলিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি, ঔপনিবেশিক কর্ত্তাদের উপর যাঁহারা কর্ত্তা—সেই ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ এবং ভারতীয়গণের স্বদেশে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়-গণের দুর্দ্দশার কথা প্রচার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। এজন্য দুইদল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী একদল লইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন—আর ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের সম্পাদক মিঃ পোলক দ্বিতীয় দল লইয়া ভারবর্ষে যাইবেন বলিয়া স্থির হইল।

মহাত্মা গান্ধী যখন ইংলণ্ডে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, তখন তাঁহার দলের কয়েকজন প্রতিনিধি নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী বলিয়া ধৃত ও বিচারে কারাগারে প্রেরিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু ইহাতেও দমিলেন না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি বিলাতে ও মিঃ পোলক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন।

মহাত্মা গান্ধী যখন বিলাতে পৌছিলেন, ট্রান্সভালের মন্ত্রীরাও তখন বিলাতে উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজী সেখানে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন—টাইমস্ প্রভৃতি শক্তিশালী সংবাদপত্র সকলও মহাত্মা গান্ধী ও

অত্যাচারিত ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া দক্ষিণআফ্রিকার অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করিতে লাগিল। ব্যাপারটা ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ দুই দলের বিরোধ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জেনারেল স্মট্—যিনি প্রতিশ্রুতির ছলে প্রবাসী ভারতীয়দিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন, তিনি—কোনরূপেই ভারতবাসীদিগের প্রতি দয়া করিতে স্বীকার পাইলেন না—আপোষে মীমাংসা করিতে স্বীকার পাইলেন না। মহাত্মা গান্ধী বেশ বুঝিলেন যে, বিলাতের কর্ত্তাদের দ্বারাও এবার কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে ফল লাভের আশায় তিনি তথায় আন্দোলন সমভাবে জাগাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। পরিশেষে আন্দোলনের ফল ফলিল—বিলাতের বহু রাজনীতি-বিশারদ ব্যক্তি, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। মহাত্মা গান্ধী ট্রান্সভালে ফিরিয়া আসিলেন।

মিঃ পোলকও ভারতবর্ষে আসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের প্রতি নির্য্যাতনের করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়া, আন্দোলনের স্রোত বহাইলেন। এই অত্যাচারক্লিষ্ট স্বজাতিগণের সাহায্যকল্পে ভারত হইতে অবিলম্বে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় হইল।

মহামতি গোখেল এই সময়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। তিনিও ব্যবস্থাপক সভায় তীব্রভাবে এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। মহামতি গোখেলের আন্দোলনের বিষয় হইল এই যে, 'ভারত গভর্ণমেণ্টইতো ভারতবর্ষ হইতে চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রমিক পাঠান, তথায় যখন উহাদের উপর অমানুষ ব্যবহার করা হয়—তাহাদের 'সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করা হয় না, তখন সে দেশে শ্রমিক পাঠাইবার ব্যবস্থা রহিত করা হউক।' মহামতি গোখেলের যুক্তির সারবত্তা ভারত গভর্ণমেণ্ট

স্বীকার করিলেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রমিক পাঠান বন্ধ হইল। এত দিনে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের ফল ফলিল, বিনা অস্ত্রে, বিনা রক্তপাতে, শুধু মনের বলে প্রতিরোধ জয়লাভ করিল।

দৈত্যবংশে প্রহ্লাদের ন্যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যেও একদল মহাপ্রাণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। তাঁহারা হক্‌সন্‌ নামে একজন ইংরেজের নেতৃত্বে একটা কমিটী স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্টের অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ঔপনিবেশিকগণ, ভারতীয় শ্রমিকগণের জীবনপণ শ্রমের ফলে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছিলেন বটে; কিন্তু ইহাদের হৃদয়ে—স্বার্থের মোহে—কৃতজ্ঞতা মোটেই স্থান পায় নাই, অধিকন্তু কৃতঘ্নতার রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ উপকারী শ্রমিকগণের প্রতি পশুর মত আচরণ করিতে তাহারা একটু মাত্র ইতস্ততঃ করিত না। এক্ষণে একদল শ্বেতাঙ্গকে এই শ্রমিকদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া, ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণের ক্রোধ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল—শ্রমিকদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য তাহারা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। ফলে আবার বিরোধের দারুণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

যে সকল ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে দলিয়া পিষিয়া ফেলিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ একটা নূতন আইন খাড়া করিলেন। সে আইনে নিয়ম হইল যে, কর্ত্তারা ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন! তাহাতে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না!!

যাহা হউক, এই অদ্ভুত আইন বলে কর্ত্তারা ভারতীয়দিগের কয়েকজন নেতাকে প্রথমে ট্রান্সভাল হইতে নেটালের সীমা পার করিয়া রাখিয়া আসিলেন। নির্ব্বাসিতেরা কিন্তু কয়েক দিন পরেই ট্রান্সভালে ফিরিয়া

আসিলেন! কর্ত্তারা তখন নিরুপদ্রব প্রতিরোধীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ৬৪ জন ভারতবাসীকে গ্রেক্‌তার করিলেন, তাঁহাদিগকে জাহাজে করিয়া একেবারে ভারতবর্ষে আনিয়া নামাইয়া দিলেন! ইঁহারাও নাছোড়বান্দা—সুতরাং পুনরায় তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। ট্রান্স্‌ভালের কর্ত্তারা খবর পাইয়া স্থির করিলেন যে, এই দুষ্মন্‌গুলিকে জাহাজ হইতেই নামিতে দেওয়া হইবে না।

যথাকালে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিল। ভারতীয়গণ কর্ত্তৃপক্ষের সংকল্প শুনিলেন; কিন্তু তাঁহারাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কপালে যাহাই থাকুক, কূলে তাঁহারা নামিবেনই। এই দলের একজন যুবকের নাম শিবস্বামী—সে দুর্জ্জয় সাহসী—সিংহ-বিক্রান্ত পুরুষ, কোন প্রকার বিপদই তাহাকে সংকল্পভ্রষ্ট করিতে পারিত না। এই যুবক সাঁতরাইয়া কূলে উঠিতে চেষ্টা করিলে, প্রহরীরা তাহাকে উঠিতে দিল না। শিবস্বামীও বিতাড়িত হইয়া এস্থান হইতে ওস্থান করিয়া একেবারে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে উপস্থিত হইল। সেখানে ডেলাগোয়া উপসাগরে পড়িয়া আর আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। রত্নাকরের অগাধ জলে অকালে সে চিরতরে আশ্রয় লইল!

শিবস্বামীর এহেন শোচনীয় মৃত্যুর কথা যখন ভারতবর্ষে পৌঁছিল, তখন এদেশবাসীর মনে নিদারুণ ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হইল। সর্ব্বত্র সভাসমিতিতে বক্তৃতা, আলোচনা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে প্রবল অন্দোলন আরম্ভ হইল। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট বিলাতের কর্ত্তাদিগকে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ফলে এই নির্ব্বাসন আইন রহিত হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধীর পক্ষ ও উপনিবেশনিবাসী ভারতীয়গণের কঠোর সাধনা সিদ্ধি লাভ করিল। শিব যেমন বিষ পান করিয়া দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন—

শিবস্বামীও তেমনি—নিজের জীবন দিয়া, বিপন্ন ভারতবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ন্ অব্ সাউথ্ আফ্রিকা অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলন নামে এক অভিনব রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সম্মিলিত রাজ্যে কেপ্‌কলোনি, নেটাল, ট্রান্স্‌ভাল ও আরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্য একত্র হয়। একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে ইহার রাজকার্য্য ন্যস্ত হয়—রাজধানী হয় ট্রান্স্‌ভালের প্রধান নগর প্রিটোরিয়া।

১৯১০ খৃঃ অব্দে মহামতি গোখেল, ভারতীয় সংবাদপত্র এবং জনসাধারণ যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, তখনই ভারতগভর্ণমেণ্ট বিলাতের কর্ত্তাদের কাছে প্রস্তাব করেন যে—"ইউনিয়নগভর্ণমেণ্ট তথায় এমন একটা আইন করুন, যাহাতে ভারতীয়দিগের আপত্তিজনক আইন গুলি রহিত, জাতিবিদ্বেষ দূরীভূত হইতে পারে। আর সেখানে কোন নূতন ভারতবাসী প্রবেশ করিতে না পারিলেও প্রতি বছর যেন শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের কতকগুলি লোক যাতায়াত করিতে পারে। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগরের অধিবাসীরা যেন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পূর্ব্বের ন্যায় সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করিতে পারে।"

উপরওয়ালার চাপে পড়িয়া ইউনিয়নগভর্ণমেণ্ট আসল আইনটা রহিত করিতে রাজি হইলেন বটে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পর বছর (১৯১১) এমন একটা নূতন আইন তৈয়ার করিলেন, যাহাতে জাতিবৈষম্য অর্থাৎ কালায় ধলায় প্রভেদতো গেলই না—অধিকন্তু সমুদ্রকূলের নগর সকলে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিয়া ভারতবাসীরা যে সুবিধাজনক অধিকার ভোগ করিতেছিল, তাহা নষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইল। ভারতীয়েরা ইহাতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, সুতরাং আইন আর পাশ হইল না।

ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট আবার রাজনীতিক চাল চালিলেন। তাঁহারা ভারতীয় নেতাদিগকে জানাইলেন যে, আগামী বছরে (১৯১২) তাঁহারা একটা নূতন আইন করিবেন, তাহাতে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া গোলযোগের মীমাংসা করা হইবে। আইন পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা যেন 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' বন্ধ রাখেন। ভারতীয়েরা এই প্রস্তাবে রাজি হইল—নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ রাখিল। তার পর যখন নূতন আইন পার্লেমেণ্টে দাখিল হইল, তখন দেখা গেল যে, উহাতে ভারতীয়গণের বিষয়ে বড় কিছু ব্যবস্থা নাই। কাজেই গোলযোগের সূত্রপাত হইল। যাহা হউক, ইহার পরও ভারতীয়েরা মীমাংসার আশায় আরও এক বছর চুপ করিয়া থাকিতে রাজি হইলেন।

মহাত্মা গান্ধী নিজের রাজনীতিক গুরু মহামতি গোখেলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। সুতরাং ভারতগভর্ণমেণ্ট ও বিলাত সরকারের সম্মতি লইয়া তিনি ১৯১২ খৃঃ অব্দে ২২শে অক্টোবর কেপকলোনির প্রধান নগর কেপটাউনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তিনি বড় অসুস্থ ছিলেন, তবু কর্ত্তব্য কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

মহামতি গোখেল তিন সপ্তাহকাল আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিলেন; শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দুই পক্ষের কথা শুনিলেন এবং আদর অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের প্রধান সচিব, ভারতীয়দিগকে বছরে যে মাথাগণ্তি ৪৫ কর দিতে হয়, তাহা রহিত করিবেন বলিয়া স্বীকার পাইলেন। মহামতি গোখেলও ভারতীয় নেতাদিগকে এই সংবাদ জানাইলেন, চারি দিকে একটা উৎফুল্লতার বাতাস বহিতে লাগিল। গোখেল হৃষ্টচিত্তে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

যে কোন প্রকারে ভারতীয়দিগকে নিষ্পেষিত করাই ঔপনিবেশিক

শ্বেতাঙ্গদিগের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহারা একটার পর আর একটা করিয়া নানাপ্রকারে তাহাদিগকে বিপন্ন, লাঞ্ছিত ও হেয় করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। মহামতি গোখেল ভারতে ফিরিয়া আসিলে, ইউনিয়ন আদালতে একটা বড় রকমের দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হইল। গভর্ণমেণ্টের অভিমত অনুসারে এই মোকদ্দমার রায়ে বিচারকেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "ভারতীয়গণের বিবাহ আইন সঙ্গত নহে—উহা অবৈধ। কেননা একটীর অধিক বিবাহ করা ইংরাজের সমাজে আইনসঙ্গত নহে!" এহেন বিচারের কথা প্রচারিত হওয়া মাত্র কেবল দক্ষিণ আফ্রিকায় নহে, ভারতেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। কোনও সভ্য সমাজই ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজ-বন্ধনকে এ ভাবে পদ-দলিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের এক সভায় ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের এইরূপ অনধিকার চর্চ্চার প্রতিবাদ করিলেন।

লোকে কথায় বলে "শিখেছ কোথায়? ঠেকেছি যথায়।" বস্তুতঃ বিপদ্ বা ঠেকার মত শিক্ষক জগতে আর নাই। বিপদ্ পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করায়, অন্ধকে দৃষ্টিদান করে, মশকের দেহে লক্ষ হস্তীর বল দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণের অত্যাচারস্রোতে পড়িয়া ভারতীয়গণ বহু শিক্ষা লাভ করিলেন—দেহে ও মনে অসীম বল লাভ করিলেন। হিন্দু মুসলমানের বিবাহ অবৈধ বলিয়া রায় প্রকাশিত হইলে—সতীত্বের হীরক-খনি ভারতের উপনিবেশ-নিবাসিনী নারীগণ পর্য্যন্ত ইউনিয়ন গভর্ণ-মেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন—নিরীহ মৃগীর হৃদয়ে সিংহীর প্রচণ্ড বলের সঞ্চার হইল।

ভারতীয়েরা এক বছর নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ রাখিয়া নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট এক নূতন

আইন পাশ করিলেন; উহাতে গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় রমণীদিগকে মুণ্ডকর হইতে রেহাই দিলেন মাত্র, কিন্তু তাহাদিগকেও প্রতিবছর ছাড়পত্র লইতে হইবে বলিয়া নিয়ম করা হইল। ইহা ছাড়া ভারতীয় পুরুষগণের জন্য কোন সুবিধাই করা হইল না। গভর্ণমেণ্টের অঙ্গীকার ও মহামতি গোখেলের আশার কথা ভোজ বাজীর মত নিমেষে লয় পাইল।

মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে মহামতি গোখেলকে তার করিলেন, উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, "ইউনিয়ন গর্ভর্ণমেণ্ট, সকলের সম্বন্ধেই মুণ্ডকর উঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।" ভারতীয়েরা তুমুল আন্দোলন করিয়াও বিলের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিলাতে আন্দোলনের জন্য একদল প্রতিনিধি পাঠাইলেন। তথাকার আন্দোলনেও কোন ফল ফলিল না।

ভারতীয়েরা নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন, আত্মরক্ষার জন্য যতদুর সম্ভব চেষ্টা করিলেন—কিন্তু গভর্ণমেণ্ট রাজনীতিক চালে ভুলাইয়া নিজেদের মৎলব সিদ্ধি করিয়া লইলেন—অঙ্গীকার পালন করিতে রাজী হইলেন না। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ ব্যাপারে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট, ভারত ও বিলাত সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি মহামতি গোখেলকে পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি দ্বারা ভুলাইয়াছিলেন!

অগতির গতি ভগবান—এক্ষেত্রেও অগতির এক মাত্র গতি নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ। ১৯১৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনন্যগতি ভারতীয়েরা আবার উহা গ্রহণ করিলেন। এবার তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে,—"যে পর্য্যন্ত (১) মুণ্ডকর রহিত, (২) বর্ণ বা জাতিগত বৈষম্য দূরীকৃত, (৩) ভারতীয়গণের বিবাহ আইন সঙ্গত বলিয়া গৃহীত, (৪) দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতীয়ের সন্তান হইয়াছে, তাহাদিগের কেপকলোনিতে প্রবেশ করিতে দেওয়া, (৫) ভারতীয়দিগের স্বার্থ বিষয়ে সকল প্রকারের সুমীমাংসা"

না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহারা এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইবে না। এবারকার কার্য্যারম্ভের প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, "এবার ভারতীয়দিগকে, মুণ্ডকর না দিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদিগকে কাজ ছাড়িয়া দিতে, বিশেষ ভাবে নিষেধ করা হইবে।"

পুরুষদিগের এই কার্য্যে সহায়তা—নিজেদের পত্নীত্ব যে আইন সঙ্গত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এবার রমণীগণও অগ্রসর হইলেন—তাঁহারা এবার যথার্থ সহধর্ম্মিণীর পদ গ্রহণ করিলেন। নেটালে ও ট্রান্সভালের জোহান্স-বার্গে দুইটী মহিলা-সমিতি গঠিত হইল, তাঁহারাও নিরুপদ্রব প্রতিরোধে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া রাজদণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। রমণীগণের এ ব্যাপারে পুরুষগণের উদ্দীপনা, সংযম ও ধীরতা অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইল।

প্রথমেই নেটালের নারী-সমিতি অসীম উৎসাহে ট্রান্সভাল সীমান্তস্থিত ভলক্সরষ্ট্ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিবামাত্র অনধিকার প্রবেশের অপরাধে ট্রান্সভাল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রত্যেককে তিন তিন মাস কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করিলেন! একদিন ভারতে যাঁহারা স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করিয়া, সন্তানগণের হৃদয় হইতে মরণ-ভয় দূর করিয়া দিতেন, আজ সেই শক্তিরূপিণী জননী-ভগিনীগণ স্বেচ্ছায় কঠোর কারাদণ্ড শিরে ধারণ করিয়া, স্বদেশসেবী পুরুষগণের হৃদয় হইতে কারা-ভোগ এবং অত্যাচার ভয় দূর করিয়া দিলেন।

অন্যদিকে জোহান্সবর্গের মহিলা-সমিতি ক্রমে ক্রমে নেটালের উত্তর সীমায় পৌঁছিলেন, কেহ তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বাধা দিল না। ক্রমে তাঁহারা নেটালের অন্তর্গত নিউক্যাসেলে আসিয়া আস্তানা করিলেন। এই স্থানের চারিদিকে অনেকগুলি কয়লার খনি আছে—সে সকল স্থানে

বহু ভারতীয় শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। মহিলাগণ, ঐ সকল শ্রমিক-দিগকে, মুণ্ডকর রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত, এক সঙ্গে কাজ ছাড়িয়া দিতে উৎসাহিত করিলেন। শ্রমিকগণ, মায়েদের আহ্বানে আত্মরক্ষায় অগ্রসর হইল। সমুদয় খনির কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

খনির মালিকেরা ডারবান নগরে এক সভা করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান করিলেন। মহাত্মাজী তৎক্ষণাৎ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, "শ্বেতাঙ্গগণ মুণ্ডকরের পক্ষে মত দিয়াছেন বলিয়াই, শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করিয়াছে—ঐ মুণ্ডকর উঠিয়া গেলে, তবে শ্রমিকগণ কাজে লাগিবে।" শ্বেতাঙ্গগণ কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে জেনারেল স্মাট্ ও জেনারেল বোথা উভয়েই স্পষ্ট বলিলেন যে, তাঁহারা মুণ্ডকর তুলিয়া দিবেন বলিয়া কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই।" এদিকে মহামতি গোখেল তারযোগে জানাইলেন যে, "কর্ত্তৃপক্ষ মুণ্ডকর তুলিয়া দিতে রাজি হইয়া-ছিলেন। দুই পক্ষের এইরূপ কথা কাটাকাটিতে মূল ব্যাপারের কোন মীমাংসা হইল না। এদিকে কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিত পাইয়া খনির মালিকেরা শ্রমিকদিগের উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করিল।

বস্তুতঃ কর্ত্তৃপক্ষের এই শক্ত বাঁধনের ফলে শ্রমিকগণের বাঁধন ক্রমে টুটিয়া আসিল। তাহারা খনি ছাড়িয়া রেলে বা পদব্রজে দলে দলে নিউক্যাসেলের দিকে আসিতে লাগিল। সে দৃশ্য বড় সুন্দর! কাহারো কাঁধে বা মাথায় দ্রব্যাদি—কাহারো কক্ষে দুগ্ধপোষ্য শিশু, হাতে আশ্রয়যষ্টি, এইরূপ অসংখ্য নরনারী বর্ষাবাদল ঝড় তুফানে কর্দ্দমাক্ত পথঘাট অতিক্রমপূর্ব্বক অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত, পরম উৎসাহে, নিউক্যাসেলের দিকে ছুটিয়াছে! কোনরূপ বিপদ বা বাধা তাহাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না!

মহাত্মা গান্ধী এই নিরন্ন—নিরাশ্রয় লোকদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য একটা সমিতির গঠন হইল, আলবার্ট

ক্রিষ্টেফার ও মিঃ ক্যালেন্‌বাচের উপর এই শ্রমিকদলের খাদ্যাদি বিতরণের ভার দেওয়া হইল।

বহু শ্রমিক আসিয়া নিউক্যাসলে জড় হইল। যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহাদ্বারা শ্রমিকদিগকে একমুষ্টি চাউল, একখানা রুটি ও সামান্য একটু চিনি মাত্র দেওয়া যাইতেছিল। তার উপর রাঁধিবার জায়গার অভাব—থাকিবার স্থান উন্মুক্ত আকাশতল! স্বয়ং গান্ধীও এইরূপ খাইয়া শুইয়া তাহাদের সঙ্গী রহিয়াছেন দেখিয়া, সেই নিরক্ষর শ্রমিকদলের প্রাণে অসীম বলের আবির্ভাব হইল—তাহারা দুঃখকষ্ট অভাব প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিল। বিশেষতঃ ভারতীয় ভদ্রমহিলাদিগকে তাহাদের জন্য জেলে যাইতে দেখিয়া শ্রমিকেরা অদম্য উৎসাহে সংকল্প সিদ্ধির জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল।

এই সময় বর্ষাকাল, মাটি সেঁৎসেঁতে। উহারই উপর অনাবৃত স্থানে সকলকে দিন রাত্রি কাটাইতে হইল। এই সময়ে অতিশয় ঠাণ্ডা লাগায় একটী ক্ষুদ্র শিশু তাহার মায়ের বুক শূন্য করিয়া অনন্তে চলিয়া গেল। সংসারীর পক্ষে ইহা অতিশয় শোকাবহ ব্যাপার হইলেও—আজ এই দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ কোমলহৃদয়া নারীর কুসুমকোমল প্রাণে জগদ্বিজয়িনী মহাশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল—সকল দুর্ব্বলতা দূর হইয়া সেখানে কর্ত্তব্যের অজেয় দুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং মৃতাপত্যা নারী স্পষ্ট ভাষায় বলিল, "যে গেছে, তার জন্য আর শোক করায় লাভ কি? যাহারা আছে, প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।" এমন প্রাণ লইয়া যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে, জগতে কদাপি তাহাদের পরাজয় ঘটে না।

নিউক্যাসলে অসংখ্য শ্রমিক আসিয়া মিলিল। কর্ত্তাদের কাছে আবেদন নিবেদনে কোন ফল হইল না; কেননা কোন ব্যাপার তাঁহাদের চোখে পড়ে না। সুতরাং এই শ্রমিক দলের ব্যাপারটা কি তাহা ইউনিয়ন

গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ বুঝাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধী শ্রমিকদিগকে ট্রান্সভালে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। সেরূপ করিলেই অনধিকার প্রবেশের অজুহাতে কর্ত্তৃপক্ষ সকলকে ধরিয়া জেলে দিবেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিবেন যে, কতগুলি লোক তাহাদের আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। এত লোককে জেলে রাখাও সহজ নহে। কাজেই এহেন আইন তুলিয়া দিতে হইবে।

বিপুল শ্রমিকদল লইয়া মহাত্মা গান্ধী নিউক্যাসল হইতে ৩০শে অক্টোবর যাত্রা করিলেন। তাঁহারা চার্লস্‌টাউনে যাইয়া আড্ডা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাত্রার আরম্ভেই কর্ত্তৃপক্ষ কয়েক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া জেলে পাঠাইলেন। শ্রমিকসঙ্ঘ ইহাতে বিন্দুমাত্র ভয় না পাইয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আগুয়ান হইল। কেহ রেলে, কেহ বা পদব্রজে চলিয়া সকলে চার্লস্‌টাউনে পৌঁছিল, চারিদিক হইতে বহু লোক আসিয়া শ্রমিকদলে যোগ দিতে লাগিল। প্রায় তিন হাজার লোক এখানে আসিয়া মিলিত হইল।

চার্লস্‌টাউনের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বলীভাই এণ্ড মক্‌তুম্ এই যাত্রীদিগের অভাবমোচনে অগ্রসর হইলেন। জোহান্সবার্গ এবং ডারবান্ হইতেও ভারতীয় বণিকেরা খাদ্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ হইতেও সাহায্যার্থ টাকা প্রেরিত হইল। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় সহরের কর্ত্তারা এই লোকগুলির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া দিলেন।

মহাত্মা গান্ধী চোরের মত অগোচরে কোন কাজ করিতে অভ্যস্ত বা প্রস্তুত নহেন—তাঁহার সব কাজ, সব কথা খোল্লাখুলি। চার্লস্‌টাউন ছাড়িয়া যাত্রা করিলেই সকলকে ট্রান্সভালের সীমায় পড়িতে হইবে। কাজেই মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের অভিযানের কথা তারযোগে ট্রান্সভালের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিলেন। তারপর সাতদিন গেল, কোন উত্তর

আসিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রমিকদিগকে ভাগাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইবার জন্য তলে তলে অনেক চেষ্টা চলিল। ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মত সে চেষ্টা একেবারে বিফল হইয়া গেল। এবার আবার কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকদল শ্রমিককে ধৃত ও অভিযুক্ত করিয়া জেলে পাঠাইলেন।

মহাত্মা গান্ধী এবার যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। মিঃ ক্যালেন্‌বাচ ও কুমারী শ্লেক্‌সিনের উপর রমণী ও বালকবালিকাদিগের ভার রাখিয়া অন্যূন দুই সহস্র শ্রমিকসহ অগ্রসর হইলেন। ট্রান্সভালের সীমায় পৌঁছিলে সীমারক্ষী কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহাদের গতিরোধ করিল। মহাত্মাজী পুলিশের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—ইতিমধ্যে শ্রমিকদল জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভলক্সরাষ্ট্রের সহরে ছড়াইয়া পড়িল। তথায় একদিন থাকিয়া আবার তাঁহারা যাত্রা করিলেন। রাত্রে তাহারা পামফোর্ড নামক স্থানে পৌঁছিলেন।

লোকে কথায় বলে "মাণের গোড়ায় ছাই না দিলে মাণ বাড়ে না" কথাটা ঠিক। মানুষও যদি মান অভিমান প্রভৃতি অষ্টপাশ ত্যাগ করিয়া সকলের সহিত আপনাকে সমান না করিতে পারে তবে সে কখনো মান পায় না, তাহাদের মানও কখন বাড়ে না। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু সত্য সত্যই মান বা মর্য্যাদা নামক অশ্বডিম্বটী বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আপনাকে সকলের মধ্যে সমভাবে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। কাজেই সকলের মান বা মর্য্যাদারাশি মিলিত হইয়া মহাত্মাজীর মান অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিয়াছিল। আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রতি কার্য্যে ও কথায় তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে।

পামফোর্ডে কতকগুলি ভারতবাসী ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের কথা জানিতেন, সুতরাং সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মহাত্মাজী কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"আমার দীনদুঃখী সঙ্গীদিগের যেমন খাওয়াপরা জুটিবে—আমিও তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিব, তাহাদের সহিত আমি সর্মসূত্রে গ্রথিত।" এইরূপ স্বজাতিবাৎসল্য, সংযম ও মহান্ ত্যাগের জন্য সঙ্গীদিগের হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মহাত্মার জন্য অক্ষয় স্বর্গীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি জগদ্বাসীর হৃদয়ে দেবতার আসন লাভ করিলেন।

ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট এবার মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিলেন। তিনিও যেন সোয়াস্তির হাঁফছাড়িয়া বাঁচিলেন। কেননা—যে গুরুতর দায়িত্ব লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে ছিলেন—গভর্ণমেণ্ট এবার তাঁহাকে সে দায়িত্ব হইতে রেহাই দিয়া নিজেদের কাঁধে তাহা তুলিয়া লইলেন। কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মদেব যেমন নিজের মরণের পথ বলিয়া দিয়া পাণ্ডবদিগের জয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীও তেমনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে নিজেরই কয়েকজন সহচরকে তাঁহারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদিতে বলিলেন। নতুবা কর্ত্তৃপক্ষ কাহার কাছে প্রমাণ পাইবেন যে তিনি অপরাধী? যাহা হউক, তাঁহাকে লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের লোক চলিয়া গেল—সঙ্গীরা কিন্তু নেতৃহীন হইয়াও সঙ্কল্পচ্যুত হইল না। তাহারা পূর্ণ উদ্যমে আবার সে স্থল হইতে যাত্রা করিল।

ইমিগ্রেসন অর্থাৎ পরদেশীর আইন অমান্য করার অপরাধে মহাত্মাজী অভিযুক্ত হইলেন। বিচারক কিন্তু ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস দিলেন। কেননা, মহাত্মা গান্ধী ছাড়া এতগুলি লোকের দায়িত্ব কে লইবে? তিনি মোটরে চড়িয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া যাত্রীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অভিযানকারীরা ততক্ষণে পার্ডিবার্গ নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

এই শ্রমিকদল চার্লস্ টাউন হইতে টলষ্টয় কৃষিক্ষেত্র পর্য্যন্ত যাইবার

সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই দুই স্থানের দূরত্ব প্রায় দুইশত মাইল। প্রতিদিন ২৫ মাইল হাটিয়া ৮ দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইবে বলিয়া ইহারা ৮ দিনের খাদ্য সঙ্গে করিয়া রওয়ানা হইয়াছিল। অতিরিক্ত হাটার জন্য কতকগুলি লোক একেবারে অচল হইয়া পড়িল, কাহারো কাহারো পায়ে ঘা হইয়া গেল। এই সকল অসমর্থ লোকদিগকে তথায় রাখিয়া মহাত্মা গান্ধী অবশিষ্ট দল লইয়া ৮ই নবেম্বর প্রাতে ষ্টাণ্ডারটন নগরে পৌঁছিলেন। কোন কোন খনির মালিক পুলিশের সাহায্যে এখান হইতে কয়েক দল ধর্ম্মঘটীকে ধরিয়া নেটালে পাঠাইয়া দিলেন, মহাত্মা গান্ধীকেও ধরা হইল। শ্রমিকেরা বিচারালয় ঘিরিয়া রহিল। তাহারা বলিল যে, "তাহাদের' নেতাকে ছাড়িয়া না দিলে তাহারা এক পা-ও নড়িবে না"; সুতরাং গান্ধী জামিনে খালাস পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সকলে আবার যাত্রা করিলেন।

পরদিন মিঃ পোলক মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; কেননা তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কাহিনী প্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষে যাইতেছেন। টিক্‌ওয়ার্থ নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে পথ চলিতে ছিলেন। এই সময়ে ট্রান্সভাল কর্ত্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিলেন—তিনিও অম্লানবদনে তাহাদের সহিত চলিয়া গেলেন।

মিঃ পোলকের ভারতবর্ষে যাওয়ার কল্পনা বিফল হইতে চলিল। মহাত্মা গান্ধীর অনুপস্থিতিতে তিনিই যাত্রিগণের নেতা হইলেন। সন্ধ্যার সময় এই দল গ্রেলিঙ্‌ষ্টাডে পৌঁছিল। মহাত্মা গান্ধীকে সরকারী লোকে ধরিয়া লইয়া যাইবার কয়েক মিনিট পরেই অন্যপথে মেসার্স ক্যাচালিয়া এণ্ড্‌ভীয়াট্ এবং ভলক্সরাষ্টের মিঃ বাডাট্ আসিয়া যাত্রীদিগের সহিত মিলিলেন। ইঁহারা যে যাত্রিদলের রসদ যোগাইবার ভার লইয়াছিলেন মিঃ পোলক তাহা জানিতেন না। রাত্রিতে বিন্দু বিন্দু বারিপাত হওয়াতে

যাত্রীদিগের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু সকলেই সে কষ্ট নীরবে সহিয়া লইল।

ভোরে আবার সকলে চলিতে লাগিল। সাড়ে তিন ঘণ্টায় তের মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ৯ টাতে সকলে ব্যালফোর নগরে পৌঁছিল। নেটালের কর্ত্তারা পূর্ব্বেই এই দলকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইবার জন্য ব্যালফোর নগরে ট্রেণ সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। যাত্রি দল পৌঁছিলে কর্ত্তৃপক্ষ এই দলের নেতা মিঃ পোলককে সে কথা জানাইলেন। সংবাদ শুনিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও ঘাড়ের বোঝা নামিল ভাবিয়া তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। মিঃ পোলক নিজেও ধরা দিতে চাহিলেন ; কিন্তু সরকারী লোকেরা তাঁহাকে ধরিল না।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া—সকলকে ট্রেণে তুলিবার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন সময়ে কয়েকজন যাত্রী জোহান্স্‌বার্গে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, অন্যান্য যাত্রীকেও দলে টানিবার চেষ্টা করিল। মিঃ পোলক দেখিলেন—এই বিপুল যাত্রী দলকে আট্‌কাইয়া রাখা পঁচিশজন পুলিশের কর্ম্ম নহে। যাত্রীরা গোঁ ধরিলে একটা রক্তারক্তি ঘটিবে—নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মূলসূত্র ছিন্ন হইবে। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক সহ সকলের সম্মুখে যাইয়া বিজ্ঞতা ও দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—"নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারীদের লক্ষ্য জোহান্স্‌-বার্গ নহে—কারাগার।" মিঃ পোলকের এই কথা শুনিয়া মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের ন্যায় যাত্রীরা নীরবে ট্রেণে উঠিল—মিঃ পোলকও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ট্রেণ চার্লস্‌টাউন পর্য্যন্ত গেলে পর মিঃ পোলকও ধৃত হইলেন।

এই যাত্রীরা ইহার আগে চার্লস্‌টাউন হইয়া গিয়াছিল, কতকগুলি পীড়িত ও পরিশ্রান্ত সঙ্গী ও স্ত্রীপুত্রাদি এখানে রাখিয়া গিয়াছিল, মিঃ ক্যালেনবাচ তাহাদের নেতা ছিলেন। এক্ষণে সকলকে চার্লস্‌টাউনে লইয়া

আসিলে, অনেকের স্ত্রীপুত্রকন্যাদি খবর পাইয়া দেখা করিবার জন্য ষ্টেসনে আসিল; কিন্তু পুলিশ প্রহরীরা কাহাকেও দেখা করিতে দিল না। কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদিগকে এখানে লইয়া আসিয়া আট ঘণ্টা সময় হাজতে রাখেন, অথচ এতটা সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। যাহা হউক, স্ত্রীপুত্রকন্যারা দেখা করিতে না পারিলেও ট্রেণ ছাড়িবার সময় তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিল যে, "কেহ যেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে।" ট্রেণ চলিয়া গেল, নিরুপদ্রব প্রতিরোধীদিগের বিরাট অভিযান শেষ হইল। ভারতীয় নরনারীদিগের এই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। একতার বলে ক্ষুদ্রও প্রবলপ্রতাপ রাজাধিরাজকে কিরূপে কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে নামাইতে পারে, এই নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তাহার একমাত্র প্রমাণ।

ভলক্সরাষ্ট বিচারালয়ের বিচারে মহাত্মা গান্ধীর পনর মাস জেল হইল। তিনি বিচারের সময় আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে "আমি কর্ত্তৃপক্ষকে যথাকালে খবর দিয়াই ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিলাম— লুকাইয়া প্রবেশ করি নাই। এ ব্যাপারে বিশেষ বিপদ্ ঘটিবে ও কষ্ট সহিতে হইবে, তাহা দেখিয়াও আমি একাজ করিয়াছি। তাহা না হইলে, একদিকে যেমন দেশবাসীদের বিবেকবুদ্ধি জাগিবে না, অন্যদিকে তেমনি সরকারেরও চৈতন্য সঞ্চার হইবে না। আমি আইন অমান্য করিয়াছি সন্দেহ নাই—কিন্তু যে সকল নাগরিক আইন মানিতেছে, তাহাদের অধিকারের দাবী করিতেছি।"

মহাত্মা গান্ধীর সহিত বহুসংখ্যক নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারী নরনারীও জেলে গেল। দমননীতির ফলে আন্দোলনের বেগ বাড়িয়া চলিল। ভারতবর্ষে, ইংলণ্ডে ও দক্ষিণআফ্রিকায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। কয়লার খনির দৃষ্টান্ত দেখিয়া, যে সকল শ্রমিক ইক্ষুক্ষেত্রে কাজ করিত তাহারাও ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িল। মালিকেরা এই সকল শ্রমিকদিগের উপর

গুরুতর অত্যাচার করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহাতেও শ্রমিকদিগকে বাধা করিতে না পারিয়া ব্লেক্‌বর্ণ্‌ ও হিল্‌হেং নামক স্থানের কুঠীতে ধর্ম্মঘট-কারীদিগের উপর গুলি চালান হইল। ফলে ছয়জন মরিল, কতকগুলি মর মর হইল।

ভারতবর্ষে যখন এই পাশব কাহিনী প্রচারিত হইল, তখন শ্রোতারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে দারুণ প্রতিবাদ এবং তীব্র নিন্দা হইতে লাগিল। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ও এই ব্যাপারের প্রতিবাদ না করিয়া পারিলেন না : মান্দ্রাজের এক সভায় ("১৯১৩।২৪শে নবেম্বর) তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে—ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের আইনকানুন অসঙ্গত, নিরুপদ্রব প্রতিরোধীদিগের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অত্যাচার হইতেছে, কোন সভ্য দেশে মুহূর্ত্তের জন্য তাহা ঘটিতে পারে না।" যাহা হউক, বড়লাট, কেবল বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকেও এ বিষয়ে অপক্ষপাত বিচার করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করিলেন।

বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ইউনিয়নগবর্ণমেণ্ট তদন্ত কমিটী গঠন করিলেন বটে, কিন্তু সে কমিটীও পক্ষপাত করাতে, ভারতীয়েরা উহা গ্রাহ্য না করিয়া প্রবল আন্দোলনের জন্য উদ্যোগী হইল।

গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মী বন্ধুদ্বয় মিঃ পোলক ও মিঃ ক্যালেন্‌বাচকে প্রিটোরিয়া জেল হইতে ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তি দেওয়া হইল।

জেল হইতে মুক্ত হইবার পরই তাঁহারা জোহান্সবার্গে চলিলেন। বিপুল সমারোহের সহিত ভারতীয়গণ ষ্টেসনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। রাজা বা রাজপ্রতিনিধির পক্ষেও এরূপ অভ্যর্থনা গৌরবজনক। জোহান্স-বার্গের প্রবাসী ভারতবাসীরা একটা সভা করিল—মহাত্মা গান্ধী সেই সভার

দৃঢ়তার সহিত স্পষ্টই বলিলেন যে, "গবর্ণমেণ্ট আমাকে ছাড়িয়া দিয়া যে, আমার কোন উপকার করিয়াছেন—আমি তাহা স্বীকার করি না। কারণ, যে কাঁজের জন্য গবর্ণমেণ্ট আমাকে জেলে পুরিয়াছিলেন—সেই কাজ করাই যে আমার কর্ত্তব্য। সরকার পক্ষ যে কমিশন গঠন করিয়াছেন, উহা দ্বারা ভারতবাসীদিগের কোনরূপ উপকার বা মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।"

পর দিন মহাত্মা গান্ধী, মিঃ পোলক ও মিঃ ক্যালেন্‌বাচের সহিত দারবানে চলিলেন। পথিমধ্যে মেরিট্‌স্‌বার্গ প্রভৃতি রেল ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া হাজার হাজার ভারতবাসী মহাত্মাকে সাগ্রহে ও বিপুল সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিল। ২০শে ডিসেম্বর দুপুরের সময় তাঁহারা দারবানে উপস্থিত হইলেন। বিপুল জনসংঘ ষ্টেসনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল—তারপর মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে গাড়ীতে বসাইয়া নিজেরা সেই গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল। গাড়ী মহাত্মাজীর বন্ধু মিঃ রুস্তমজীর গৃহে উপস্থিত হইল।

২১শে ডিসেম্বর দারবানে এক সভা হইল—অন্যূন সাত হাজার লোক উপস্থিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিঃ পোলক, মিঃ ক্যালেন্‌বাচ, মিঃ রীচ এবং মিঃ বেলীও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—ইঁহারাও কয়েদ হইতে মুক্ত হইয়া ফিরিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই সভাতে ধুতি জামা পরিয়া, অনাবৃতমস্তকে ও অনাবৃতপদে সাধারণ মজুরের বেশে আসিয়াছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আজ হইতে আমি এই নূতন পোষাক পরিব বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি। আমার দেশবন্ধুর উপর যে গুলিচালান হইয়াছে—উহাতে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে। উহার একটি গুলিও যদি আমার গায়ে লাগিত, তবে খুবই ভাল হইত। আমারই পরামর্শে পড়িয়া ভারতীয় লোকেরা গুলিতে দেহ ত্যাগকরিয়াছে—সুতরাং

পরোক্ষভাবে আমি হত্যাকারী হইতেছি বটে—কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে—আমি নির্দ্দোষ। দেশবাসীর মরণের জন্য আমি অন্তরে বাহিরে শোক প্রকাশ করিতেছি। বাহিরের শোক প্রকাশের জন্যই আমি আজ হইতে এই সাধারণ মজুরের বেশধারণের সঙ্কল্প করিয়াছি। আর আন্তরিক শোক প্রকাশের জন্য—আজ হইতে দিনে কেবল একবার মাত্র ফল আহার করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। যত কাল বাঁচিব এই সঙ্কল্প পালিব। গবর্ণমেণ্ট আমাদের আবেদন না শুনিলে ১৯১৪ সনের ১লা জানুয়ারী আবার ভারবাসীদিগকে একযোগে যাত্রা করিয়া ট্রান্স্‌ভালের সীমা অতিক্রম করিতে হইবে।"

অপর ইংরেজ চারিজনও সভায় বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতারা মহাত্মা গান্ধীর পোষাক দেখিয়া অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল। যাহা হউক, তাঁহারা অনুসন্ধান সমিতিতে ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দুইজন শ্বেতাঙ্গকে নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা জানাইলেন এবং ভারতীয়দিগকে জেল হইতে মুক্তি দিবার প্রার্থনা করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার একটাও স্বীকার করিলেন না।

২২শে ডিসেম্বর—পূর্ণ তিন মাস কারাবাসের পর—একদল কয়েদী পিটারমেরিট্‌স্‌বার্গের জেল হইতে মুক্ত হইলেন। এই দলে মহাত্মা গান্ধীর পত্নী, ডাক্তার মণিলালের সহধর্ম্মিণী, ছগনলালের স্ত্রী, মগনলালের স্ত্রী, সলোমান বায়পণের স্ত্রী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ সম্মান এবং সমারোহের সহিত সকলকে গৃহে লইয়া গেলেন। দারবানে পৌঁছিলে সকলে রুস্তমজীর গৃহে গেলেন। দারবানের সেণ্ট্রাল জেল হইতে উক্ত ২২শে ডিসেম্বরই রুস্তমজী প্রভৃতি এগারজন সত্যগ্রাহী মুক্ত হইয়াছিলেন। ২৯শে ডিসেম্বর, ট্রান্স্‌ভালস্থিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ বদ্রি, পদ্মসিং, ভবানী দয়াল ও তকু দারবানের জেল হইতে মুক্ত হন, মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং জেলের দুয়ারে যাইয়া ইঁহাদিগকে অভ্যর্থনা

করিয়া রুস্তমজীর গৃহে লইয়া আসেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেও দরবানের জেল হইতে অনেকে মুক্তিলাভ করেন। মহাত্মা গান্ধী ইঁহাদিগকেও বিপুল উৎসাহে ও সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া রুস্তমজীর গৃহে আনয়ন করেন। জাতীয় স্বার্থ ও মনুষ্যত্ব রক্ষায় প্রবাসী ভারতীয়েরা এ সময়ে উত্তম, উৎসাহ ও সংযমের জ্বলন্ত বিগ্রহে পরিণত হইয়াছিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষ তারিখে ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন পত্রের আকার পরিবর্ত্তিত হয়—উহা আবার হিন্দী ও তামিল ভাষায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। উহার হিন্দী সংস্করণের আরম্ভে সেই সময়ে এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল যে,—"অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য এ সময়ে যে ভাবে লড়াই চলিতেছিল, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত একপ্রকার নাই বলিলেও চলে। এই লড়াইয়ে হিন্দী ও তামিল ভাষাভাষী নরনারীরাই প্রধানের আসন লইয়াছেন—পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—অনেকে গোরা সৈনিকের গুলিতে প্রাণ ত্যাগও করিয়াছেন। এই নরনারীদিগের সম্মানের এবং স্মৃতিরক্ষার জন্য হিন্দী ও তামিল ভাষায় পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হইল।" মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষায় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ কিরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল—মনুষ্যত্বরক্ষায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল—ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়নের উপরি উক্ত মন্তব্য টুকুতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। স্কুল কলেজের প্রাণহীন পুঁথিগত শিক্ষার সহিত এইরূপ জাতীয় শিক্ষার কতই না প্রভেদ !!

মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতারা জেলে যাইয়া কি ভাবে কত কষ্টে দণ্ডের কাল কাটাইয়াছেন—সুদীর্ঘ তারের খবরে সে বার্ত্তা মাননীয় গোখেলকে জানাইয়াছিলেন। সেই টেলিগ্রামের শেষাংশে জানান হইয়াছিল যে,—"জেলে যে বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করা হয়, তাহাতে জনসাধারণ বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—সত্যাগ্রাহী—যাঁহারা জেল হইতে খালাস

পাইয়াছে তাহারাও দরকার হইলেই আবার জেলে যাইতে প্রস্তুত আছে।” অক্ষরজ্ঞানবর্জ্জিত হইলেও প্রকৃত শিক্ষায় মানুষ কতদূর হৃদয়ের বল লাভ করে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়াছিল।

এই সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক মিঃ এণ্ডরুজ ও মিঃ পিয়ার্সন— দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিত হইয়া অত্যাচারক্লিষ্ট, বিপন্ন ভারতীয়গণের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও অপক্ষপাতের ফলে কমিশন ভারতীয়দিগের পক্ষেই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

তদন্তসমিতির মন্তব্য অনুসারে ১৯১৪ খৃঃ অব্দে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান্ রিলিফ্ এ্যাক্ট বা ভারতীয়-মুক্তি-বিধান নামে একখানা নূতন আইন রচনা করিলেন। এই আইনের ফলে মুণ্ড-কর রহিত হইল, জাতিবৈষম্য তুলিয়া দেওয়া হইল, ভারতীয়গণের বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইল। আবার জেনারেল স্মাটস্‌ও মহাত্মা গান্ধীকে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, ভারতীয়দিগের আর আর অভিযোগগুলি তিনি ক্রমে দূর করিয়া দিবেন। একতার ফল ফলিল—নাগরিকেরা তৎফলে নিজেদের অধিকার বুঝিতে শিখিল, কর্ত্তৃপক্ষকে অন্যায় ও পক্ষপাত হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিল। অশিক্ষিত এবং নিরন্ন হইলেও শ্রমিকগণই যে দেশের মেরুদণ্ড জগৎ সমক্ষে তাহা প্রমাণিত হইল। প্রেমিক-প্রধান নিত্যানন্দের ন্যায় মহাত্মা গান্ধী, প্রহার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংযম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা জয়-যুক্ত হইলেন।

১৯০৬ খৃঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘নিরুপদ্রব প্রতিরোধ’ ব্রত অবলম্বন করেন—ক্রমাগত আট বছর চেষ্টার ফলে ১৯১৪ খৃঃ অব্দে তাহা সফল হইল। তিনি, যে ধৈর্য্য, সংযম ও সহন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—যে স্বদেশপ্রিয়তা, সমদর্শন ও জাতীয়স্বত্বরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছেন, জগতে এমন দৃষ্টান্ত আর একটীও নাই। এই গুণেই

তিনি লোকের কাছে দেবতার ন্যায় সম্মানিত—এবং নেতা বলিয়া গৃহীত। যাহা হউক, এতদিন পরে তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ত্তব্য শেষ হইল।

মহামতি গোখেল এ সময়ে ইংলণ্ডে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার রাজনৈতিক গুরুর সেবাশুশ্রূষার জন্য বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ভারতীয়গণ জোহান্স্‌বার্গে এক সভা আহ্বান করিয়া মহাত্মাজীকে অভিনন্দিত করিল। তিনিও সস্ত্রীক ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। মহামতি গোখেল তখন আরোগ্য লাভকরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

১৯১৪ খৃঃ অব্দে ৪ঠা আগষ্ট ইউরোপের মহাসমর জ্বলিয়া উঠিল, জার্ম্মানীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষিত হইল। মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনে উদ্যোগী হইলেন—নিজে সস্ত্রীক তাহাতে নাম লিখাইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আট বৎসরের শ্রমে ও নির্য্যাতনে তাঁহার দেহ একবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—সুতরাং বন্ধুবর্গের পরামর্শে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

ভারতেও তাঁহার বিপুল অভ্যর্থনা হইল। ভারত সরকার, নববর্ষ উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীকে "কৈশার-ই-হিন্দ" নামক স্বর্ণপদক দিয়া সম্মানিত করিলেন। মহামতি গোখেল এই সময়ে পরলোক গমন করিলেন।

(৮)

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। দেশবাসী তাঁহাকে বিপুল সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি দেশবাসীদিগকে জানাইলেন যে, "দেশ-মাতৃকার সেবার জন্যই তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন।"

মহামতি গোখেল মহাত্মাজীকে বলিয়াছিলেন যে, "স্বচক্ষে দেশের অবস্থা না দেখিয়া, এদেশের সম্বন্ধে যেন কোন মন্তব্য প্রকাশ করা না হয়।"

তদনুসারে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে অভিলাষী হন। দেশের লোকের প্রকৃত অবস্থা জানাই তাঁহার ইচ্ছা, সুতরাং দেশের যাহারা মেরুদণ্ড স্বরূপ—আহারবিহার, সাজসজ্জা, আচারব্যবহার, কথাবার্ত্তা সর্ব্বপ্রকারে যাহারা কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত, সেই দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা জানিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ভারতভ্রমণ কালে সর্ব্বদা রেলপথে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে কত কষ্টে যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের প্রতি রেল কর্ম্মচারীরা কি অমানুষিক ব্যবহার করে, মহাত্মাজী স্বয়ং তাহা ভোগ করিয়া সংবাদ-পত্রে সে সকল কাহিনী প্রচার করিলেন।

ভারতভ্রমণ উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী একবার কলিকাতায় আসিবেন বলিয়া স্থির হয়। কলিকাতার কর্ম্মীরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য অতিশয় আড়ম্বরে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। যথাকালে গাড়ী ষ্টেশনে আসিলে, অভ্যর্থনাকারিগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদয় গাড়ী পাতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না! সকলেই হতাশ হইয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় দেখা গেল যে, মহাত্মা গান্ধী একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে নামিতেছেন, তাঁহার পায়ে জুতা নাই—পরণে অতি সামান্য পরিধেয়! নিজের অসাধারণ শক্তি দ্বারা যিনি বিশ্বে স্বনামধন্য পুরুষ হইয়াছেন—এই কি সেই মহাত্মা গান্ধী! সকলেই বিস্ময়-রোমাঞ্চিত-দেহে বহুমানের সহিত মহাত্মাজীকে গ্রহণ করিলেন।

১৯১৬ খৃঃ অব্দে বড়দিনের ছুটিতে লক্ষ্ণৌনগরে কংগ্রেস বসে। সেই কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীকে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য বিহারের প্রতিনিধিগণ অনুরোধ করেন, মহাত্মাজী কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কেননা, তিনি কাহারো কোন কথায় নির্ভর না করিয়া স্বয়ং সকল জানিয়া শুনিয়া যে কোন কাজ করেন—করিতে ভালবাসেন।

সাত আট বছর পূর্ব্বেই বিহার প্রদেশের মতিহারী অঞ্চলে দরিদ্র চাষী প্রজাদের সহিত নীলকুঠীর সাহেবদের ভীষণ হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। হাঙ্গামার কারণ প্রজাগণের উপর অসহনীয় অত্যাচার। সাহেবেরা প্রজাদিগকে এক প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া নীলের চাষ করাইতেন, কিন্তু জর্ম্মণেরা এমন সস্তায় নীল রং বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল যে, তাহার সহিত টক্কর দেওয়া নীলকরদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইল। কাজেই দায়ে পড়িয়া এদেশের নীলকুঠীর সাহেবেরা নীলের চাষ তুলিয়া দিলেন। নীলের চাষ উপলক্ষে জমিদার সাহেবেরা প্রজাগণের উপর যে সকল অত্যাচার করিত—তাহার আভাস নীলদর্পণ নাটক পড়িলে কতকটা জানা যায়।

অত্যাচারের ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া হাঙ্গামা বাধায়। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ গুর্লে সাহেবের উপর উহার তদন্তের ভার পড়ে, তিনি তদন্ত করিয়া গভর্ণমেণ্টে একটা রিপোর্ট দাখিল করেন। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু সে রিপোর্টের কোন কথা প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক, নীলকুঠীর সাহেবেরা এর পরে প্রজাদিগকে নীলচাষের চুক্তি হইতে মুক্তি দিবার জন্য বহু টাকা সেলামী আদায় করিতে লাগিলেন, কোন কোন স্থানে পাকা জমার হারও বাড়ান হইতে লাগিল। দরিদ্র প্রজারা করভারে প্রপীড়িত হইয়া ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। এদিকে আবার গভর্ণমেণ্ট হইতে জরীপ আরম্ভ হইল, তাহার ফলে জমিজমা লইয়া এত মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হইল যে, প্রজারা তাহাতে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা চারিদিক হইতে প্রতিবাদের ঘোর কোলাহল উপস্থিত করিল। এই ব্যাপার লইয়াই কংগ্রেস, সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদিগকে লইয়া একটা তদন্তসমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মহাত্মা গান্ধী ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে রাজি হইলেন না বটে,

কিন্তু তিনি তখন বলিলেন যে, স্বয়ং ঐ সকল ব্যাপার জানিয়া শুনিয়া শেষে যাহা সঙ্গত মনে হয় করিবেন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পর—পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে, কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিবার সময় বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে চলিলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি মজঃফরপুরে উপস্থিত হইলেন। বিহার দেশে প্লাণ্টার্স এসোসিয়েসন বা কৃষিসমিতি নামে একটা সভা আছে, মিঃ উইলসন উহার সভাপতি। মহাত্মাজী তাঁহার সহিত এবং ত্রিহুতের কমিশনার মিঃ মার্শেডের সহিত দেখা করিলেন—নিজের উদ্দেশ্যের কথা তাঁহাদিগকে জানাইলেন। সাহেবেরা মহাত্মা গান্ধীকে একাজ হইতে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন এবং একথাও বলিলেন যে, তিনি বাহিরের লোক—বিহারের প্রজা, জমিদার কিংবা গভর্ণমেণ্টের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; কাজেই তিনি যদি মাঝখানে আসিয়া এরূপ কাজে যোগ দেন, তবে বিশেষ গোলযোগই হইবে।

কমিশনার সাহেব মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনাকে এ কাজে ডাকিয়া আনিল কে?" তিনি উত্তরে বলিলেন "দেশের লোকের ডাকে আমি এ কাজে আসিয়াছি। আপনারা আমাকে এই কাজে সাহায্য করিলে আমিও আপনাদিগকে সাহায্য করিব।" কমিশনার সাহে কিন্তু এ প্রস্তাবে মোটেই মত দিলেন না।

কবি লিখিয়াছেন—

......................পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি?

মহাত্মা গান্ধীর গতিরও রোধ হইল না, তিনি কাহারো বাধা মানিলেন না। ১৫ই এপ্রিল তিনি মতিহারী চলিলেন। এদিকে কমিশনার

সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে চম্পারণের ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে, এক নোটিস দিয়া জানাইলেন যে—"তিনি ঐ জেলায় থাকিলে শান্তিভঙ্গ এমন কি লোকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি ফেরৎ গাড়ীতেই যেন জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যান।" ইহার উত্তরে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, "আমি সাধারণের যে গুরুতর কার্য্যভার লইয়াছি, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে এখানে থাকিতেই হইবে। এই অবাধ্যতার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যদি আমাকে দণ্ড দেন, আমি তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিব।"

কর্ত্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীকে আইনের আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন। তিনিত ইহার পূর্ব্বে বহুবারই আসামী হইয়া কাঠরায় দাঁড়াইয়াছেন! যাহা হউক, এবার তিনি নিজের কাজের স্বপক্ষে একটা এজাহার দিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"সরকারী আদেশ ও আইন অমান্য করিয়া কেন যে আমি গুরুতর দায়িত্ব ভার ঘাড়ে লইয়াছি, তাহার একটা কারণ জানাইতে চাহি। সরকারী কর্ম্মচারিগণের সহিত আমার মতের মিল নাই বলিয়াই আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। মানবজাতির কল্যাণ এবং স্বজাতির সেবা করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। রায়তদিগের সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণ আমাকে এখানে আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিল। রায়তেরা বলে যে, নীলকর সাহেবেরা তাহাদের উপর অতিশয় অত্যাচার করে, সে কথা কত দূর সত্য, তাহা জানিলে তবেই আমি রায়তদিগের সাহায্য করিতে পারিব। এখানে আমি শুধু সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। সুতরাং আমি এদেশে থাকিলেই শান্তিভঙ্গ হইবে অথবা লোকের প্রাণহানি ঘটিবে, এ কথা আমি বিশ্বাসই করি না। এরূপ ব্যাপারে আমার প্রভূত অভিজ্ঞতা আছে।

"সরকারী কর্ম্মচারীরা অন্য রকম অনুমান করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ব্যাপারটা পাকাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের অসুবিধার কথা আমি বেশ বুঝি, কিন্তু ইহাও জানি যে, তাঁহারা কেবল পরের দেওয়া সংবাদের উপরেই নির্ভর করেন, তাহার সত্যতা বা অসত্যতার সন্ধান করেন না। কাজেই অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে ভ্রান্তিতে পড়িতে হয়।

"আমি চিরকালই আইন মানিয়া চলি, এক্ষণেও আমার আইন মানিয়া চলাই উচিত। কিন্তু যাহাদের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, তাহাদের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে, সে কর্ত্তব্য পালন না করিয়া আমি শুধু সরকারী হুকুম পালন করিতে পারি নাই। রায়তদিগের মধ্যে থাকিলেই আমি ঠিক মত কাজ করিতে পারিব বলিয়া আমার বিশ্বাস; সুতরাং আমি এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারি নাই—পারিবও না। শাস্তির পরিমাণ কমাইবার জন্য আমি এ সকল কৈফিয়ৎ দিতেছি না—এবং রাজশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াও আমি আইনের আদেশ অমান্য করি নাই। হৃদয় হইতে বিবেক আমাকে যে আদেশ করিয়াছে আমি সেই আদেশেই এ কার্য্য করিয়াছি।"

মুহূর্ত্তমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অভিযুক্ত হওয়ার কথা ভারতের পল্লীপ্রান্তর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল—দেশময় একটা আতঙ্কের সাড়া পড়িল। মহাত্মা গান্ধীর সহযোগী, মিঃ পোলক—সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া বিদ্যুৎবেগে বাঁকিপুরে উপস্থিত হইলেন। বেহারের নেতা মিঃ হাসান ইমাম, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিং, ব্যারিষ্টার মিঃ মজরুলহক্ প্রভৃতির সহিত মিঃ পোলক তৎক্ষণাৎ মতিহারী যাত্রা করিলেন। জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন ও সংবাদপত্রে তীব্র আলোচনা চলিল; প্রতিকারের জন্য ভারতসরকারের কাছে অনবরত তার যাইতে লাগিল। সাড়া ভারত এ ব্যাপারে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বেহার সরকার বুঝিলেন যে, ব্যাপারটা ভাল হয় নাই। ভারতসরকারও ইঙ্গিতে সেই মত প্রকাশ করিলেন—গান্ধী মুক্তি পাইলেন। মুক্তি পাইয়াই তিনি যে কাজে গিয়াছিলেন, সেজন্য—উদ্যোগী হইলেন। এবার বিহারসরকার মহাত্মা গান্ধীর সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মহাত্মাজী গ্রামে গ্রামে যাইয়া রায়তগণের মুখে তাহাদের অভিযোগের কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। বিহার-সরকারও একটা তদন্ত-সমিতি গঠন করিয়া তদন্তে নামিলেন—মহাত্মাজীকে এই সমিতির সভ্য করিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। সমিতি নানাস্থান ঘুরিয়া প্রজা ও নীলকর সাহেবদিগের সাক্ষ্য লইয়া বুঝিলেন যে, নীলকরগণের অত্যাচারের কথা মিথ্যা নহে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট 'চম্পারণ কৃষি আইন' নামে এক আইন পাশ করিয়া দরিদ্র কৃষকগণের কতকটা উপকার করিলেন। মহাত্মাজীর চেষ্টা ফলবতী হইল—তাঁহার দৃঢ়তা ও সংযম জয়যুক্ত হইল।

অত্যাচারী স্বার্থপর নীলকর সাহেবেরা এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য আসরে নামিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু তাহারা মহাত্মাজীর মনুষ্যত্ব, পরোপকার, দৃঢ়তা ও সত্য-প্রিয়তার কাছ দিয়া ঘেঁসিতে না পারিয়া—তিনি যে ধুতি-চাদর-জামা পরেন, জুতা পরেন না, সে কথা লইয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছিল! সে প্রবন্ধে সুরুচি বা সাধুতার লেশ মাত্র ছিল না—উহার আগাগোড়া বিদ্বেষ ও বিদ্রূপে পূর্ণ ছিল। মহাত্মাজী তখন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "বিদেশী সভ্যতা আমি চুল চিড়িয়া বুঝিয়া দেখিয়াছি। তাহাতেই আমি—আমার জাতীয় পোষাকের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছি। এই পোষাক আমাদের জাতীয়তার সম্পূর্ণ উপযোগী—বিদেশী পোষাক পরায় জাতির অবনতি, হীনতা ও দুর্ব্বলতা ঘটে, উহার মত পাপ আর নাই। দেশের আবহাওয়া ও

স্বাস্থ্যের পক্ষে এ পোষাক যেমন উপযোগী—ব্যয়বাহুল্য রহিতের পক্ষেও ইহা তেমনি উপযোগী। ইংরেজগণ যদি—মিথ্যা অহঙ্কার, অযথা মানহানির কল্পনা ছাড়িতে পারিতেন, তবে বহুকাল আগেই ভারতের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিতেন। জুতা ব্যবহার না করিলে শরীর ও মন পবিত্র থাকে, ইহাই আমার বিশ্বাস; তা ছাড়া উহাতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।”

বিহারের কর্ম্ম শেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধী লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশবাসীকে তিনি কি ভাবে শিক্ষিত করিতে চাহেন, আমেদাবাদ নগরের সত্যাগ্রহাশ্রম তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত। মহাত্মা গান্ধী নিজে ঐ আশ্রমের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তিনি একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়াই জীবনে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং দেশবাসীকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যাশয়ী করিতে অভিলাষী।

আমেদাবাদের আশ্রমে শিক্ষার্থিগণ উর্দ্দু, বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু ও নাগরী অক্ষরে শিক্ষা লাভ করে। তাহাদিগকে ইংরেজীও শিখিতে হয়, কিন্তু মুখ্যরূপে দেশীয় ভাষাই শিক্ষার্থীদিগকে শিখিতে হয়। শিক্ষাকাল দশ বছর, এই সময়ের মধ্যে কোনও ছাত্র আশ্রম ছাড়িয়া মা বাপের কাছে যাইতে পারে না। ছাত্রদিগকে নিয়মিতভাবে ধর্ম্ম, বয়ন ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ছাত্রেরা যাহাতে যথার্থ মানুষ হইতে পারে—স্বাবলম্বী হইয়া সংসারে চলিতে পারে—এখানে তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সত্যগ্রহাশ্রমের ছাত্রদিগকে এইরূপ শপথ করিতে হয় যে, তাহারা (ক) সর্ব্বদা সত্য কহিবে; (খ) হিংসা করিবে না; (গ) চিরজীবন কুমার থাকিবে; (ঘ) আহারে লোভ ত্যাগ করিবে; (ঙ) পরের দ্রব্য তৃণবৎ ত্যাগ করিবে; (চ) যাহা না হইলেই নহে এমন দ্রব্য ব্যতীত

অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিবে না ; (ছ) জীবনে কোন প্রাণীর নিকট ভীত হইবে না ; (জ) স্বদেশিব্রত গ্রহণ করিবে ; (ঝ) পতিতের উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করিবে।” এই পণ লইয়া যাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হয়, তাহারা যে যথার্থই মানুষ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মহাত্মা গান্ধী এই ভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ওদিকে ইউরোপীয় যুদ্ধ দিন দিন ভীষণ-ভাব ধারণ করিতেছিল। প্রভূত অর্থ ও সেনার সাহায্য না পাইলে ইংরেজকে বিপন্ন হইতে হইবে—সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে সাহায্য চাই এই জন্য বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ১৯১৮ অব্দের এপ্রিল মাসের শেষে একটা পরামর্শ সভার আহ্বান করেন। উহাতে ভারতের রাজন্যবর্গ ও জননায়কগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীরও নিমন্ত্রণ হইল।

মহাত্মা গান্ধী চিরকালই সত্য ও ন্যায়ের সেবক, হিংসা ও ভয়কে তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করেন। বড়লাটের এই নিমন্ত্রণের ব্যাপারেও তিনি নিজের জীবনের যথার্থ আদর্শ প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হইলেন না—বড় লাটের ত্রুটি ধরিয়া দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। মহাত্মা গান্ধী জানিতে পারিলেন যে, এই মন্ত্রণা-সভায় ভারত-তিলক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের নিমন্ত্রণ হয় নাই, মিসেস্ বেসাণ্ট বা শক্তিশালী লোক-নায়ক মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীরও নিমন্ত্রণ হয় নাই। অমনি তিনি সভার পূর্ব্বদিন তারযোগে বড়লাটকে জানাইলেন যে, “যে সভায় এই জননায়কদিগের নিমন্ত্রণ হয় নাই, সে সভায় তিনি যাইতে পারিবেন না।” বড় লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মহাত্মা গান্ধীকে তার করা হইল, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন বটে ; কিন্তু তেমন উৎসাহের সহিত সভার কার্য্যে যোগ দিতে পারিলেন না।

এই মন্ত্রণাসভার অধিবেশনে ভারতের রাজন্যবর্গ বহুমূল্য বিচিত্র

বেশভূষা পরিয়া আসিয়াছিলেন। সরকারী বেসরকারী বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক দরবারের সম্মান রক্ষার জন্য নানা-বেশে সজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রাণ—স্বদেশী ব্রতের একনিষ্ঠ সেবক মহাত্মা গান্ধী, নিজের জাতীয় পরিচ্ছদ ধুতিচাদর পরিয়া এ হেন রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন!! কেবল কি তাহাই, সভার প্রস্তাব সকল সমর্থনকালেও মহাত্মা গান্ধী হিন্দী ভাষায় তাহার সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিলেন!! এই ব্যাপারেই মহাত্মাজীর দৃঢ়তা, স্বদেশ-প্রিয়তা ও স্বজাতি-সম্মান-বোধের অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্যাগ্রহাশ্রমের ছাত্রদিগকেই যে শুধু কতকগুলি শপথ লইয়া কাজ করিতে হয়, তাহা নহে—মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং সে সকল শপথ প্রাণপণে পালন করিয়া শিক্ষার্থিগণের কাছে দৃঢ়তর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সংযম ও স্বাধীনতা-হীন শিক্ষকের ন্যায় "আমি যাহা বলি তাহা কর" এই টুকু উপদেশ দিয়াই তিনি নিজের কর্ত্তব্য শেষ করেন না।

এই বছরই গুজরাটের কয়রা জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। প্রজারা অনেকেই আধপেটা খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল, কাহাকে কাহাকেও উপবাস করিতে হইল। অজন্মাই এই দুর্ভিক্ষের একমাত্র হেতু। দরিদ্র প্রজারা যতদূর পারিল ঘরের জিনিষ-পত্র,গাই-বাছুর বেচিয়া খাজানা দিল—শেষে তাহাও আর পারিয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিল না। সরকার কোন কোন গ্রামের খাজানা আদায় বন্ধ রাখিলেন বটে, কিন্তু অনেক গ্রামেই খাজানা আদায় করা হইতে লাগিল।

আমেদাবাদে "গুজরাট সভা" নামে একটা সভা আছে। মহাত্মা ঐ সভা হইতে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে একদল প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খাজানা আদায় স্থগিত রাখিবার জন্য কমিশনার সাহেবকে অনুরোধ করা হইল।

মিঃ প্রাট্ বিভাগীয় কমিশনার ; তিনি প্রতিনিধিদিগের অনুরোধে আদৌ কাণ দিলেন না—বরং বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা সরকারের সাহায্য না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন—এদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজার দুরবস্থা দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রজাদিগকে "সত্যগ্রহ" লইতে উৎসাহিত করিলেন—প্রজারাও দৃঢ়ভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ করিল। মহাত্মা গান্ধী প্রজাদিগকে ধীরতার সহিত অবিচলিতভাবে চলিতে এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত ভদ্রব্যবহার করিতে উপদেশ দিলেন। প্রজারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, "যতক্ষণ না গভর্ণমেণ্ট তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, ততক্ষণ তাহারা সরকারী খাজানা দিবে না।" ফলে রাজায় প্রজায় বেশ মন কষাকষি পাকিয়া উঠিল।

কমিশনার মিঃ প্রাট্ গোড়া হইতেই মহাত্মা গান্ধীর ব্যাপারে বিরক্ত ছিলেন, এক্ষণে প্রজাদিগকে খাজানা দেওয়া বন্ধ করিতে দেখিয়া জানাইলেন যে, "ইহাতে কৃষকগণেরই ষোল আনা ক্ষতি হইবে। স্বরাজ লাভেচ্ছুগণ এক্ষণে তাহাদিগকে উৎসাহ দিলেও ক্ষতির কালে কৃষকদিগেরই হইবে।" কৃষকেরা কিন্তু তাহাতেও সত্যগ্রহ ছাড়িল না। কমিশনার সাহেব এবার প্রজার যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া সরকারী খাজানা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বহু শত ব্যক্তির ঘরবাড়ী, জমিজমা, গরু-বাছুর নিলামে বিকাইয়া গেল। প্রজারা সব সহিতে লাগিল—একটু মাত্রও চঞ্চল হইল না।

মহাত্মা গান্ধী নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনিও প্রজাদিগকে কর্ত্তব্যপথে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার জন্য সভা করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—"ভারতের সমুদয় লোক আজ কয়রার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—বর্ত্তমান সংঘর্ষে তোমরা যদি পরাস্ত

হও, তাহাহইলে ভারতের কৃষকগণের আর মাথা তুলিবার উপায় থাকিবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, কিন্তু কাজে লাগিয়া গেলে আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে—যে তাহা করে, সে মানুষ নামে পরিচিত হইবার যোগ্য নহে। মানুষ যে ভূমিতে বাস করে, তাহারই মূল্য হয়, জন-মানবহীন প্রস্তরের কোনই মূল্য নাই। যদি প্রজার বসতি না থাকিত, তবে কয়রার ভূমির কোনই মূল্য থাকিত না। তোমাদের সহিত আজ সরকারের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতো খাজানা রেহাই পাইবার জন্য নহে—উহা শুধু নীতি রক্ষার জন্য।"

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে প্রজাগণ অচল অটল হইয়া রহিল—বিন্দু মাত্রও অত্যাচার বা অনাচারের আশ্রয় লইল না। এদিকে এপ্রিল মাসের শেষে বোম্বাই সরকার এক ইস্তাহার জারি করিয়া প্রচার করিলেন যে—"কয়রার প্রজারা যে খাজানা রেহাই বা স্থগিত রাখিবার দাবী করিতেছে, তাহাতে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া সরকারের দয়ার উপর নির্ভর করে।"

মহাত্মা গান্ধী এই ইস্তাহারের উত্তরে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, "প্রজার খাজানা মাপ করা বা আদায় স্থগিত রাখা সরকারের দয়ার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু প্রজারও তো একটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; "সুতরাং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে শাসন করাও কখনো সঙ্গত নহে।" ইহার পরে চারি দিকে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এদিকে প্রজাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনিয়া বোম্বায়ের ধনী বণিক্‌গণ চারি দিক্ হইতে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু প্রজাদিগকে শিখাইলেন যে,—"কষ্ট না করিলে ভগবানের দয়া পাওয়া যায় না—সত্যগ্রহীর পক্ষে সত্য ছাড়া আর কাহারো সাহায্য গ্রহণ

করা কখনই উচিত নহে।" প্রজারা দেবতার আদেশের মত এই উপদেশ পালন করিল। অনটন, অনশন, প্রায়োপবেশনে প্রজাকুল ধ্বংসের দিকে চলিল—তবু সত্য ছাড়িল না—পরের সাহায্য লইল না। জুন মাসে কর্ত্তৃপক্ষের মন একটু নরম হইল, তাঁহারা আপাততঃ খাজানা আদায় বন্ধ রাখিতে রাজি হইলেন। তবে যাহারা খাজানা দিতে সমর্থ, তাহারা যাহাতে খাজানা দেয় তাহার উপায় করিতে অনুরোধ করিলেন।

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃপক্ষের এই ন্যায্য প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। মহাত্মাজীর চেষ্টায় অবিলম্বে সমর্থ প্রজারা খাজানা মিটাইয়া ফেলিল, প্রজারাই বিচার করিয়া অক্ষমদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারের হাতে দিল। কয়রার হাঙ্গামা মিটিল—প্রজাগণের আত্মসম্মান বজায় রহিল—মহাত্মাজীর জয়গানে সমুদয় ভারত পরিপূর্ণ হইল।

(৯)

কয়রার হাঙ্গামা মিটিল বটে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কার্য্য থামিল না, বরং কার্য্য-ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া উঠিল। কেন না তিনি ইউরোপীয় সমরে ইংরেজকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য-সংগ্রহে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই মর্ম্মে একখানা ঘোষণা প্রচার করিলেন যে—"শুধু কথায় ভারতবাসীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশী হইতে পারিবে না—অংশী হইতে হইলে তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ করিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি অক্ষুন্ন থাকে, তবেই আমাদের কল্যাণ স্থায়ী হইবে—উহা ধ্বংস পাইলে আমাদের সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হইয়া যাইবে। ভারতবাসীরা যে যুদ্ধবিদ্যায় পটু—অস্ত্রচালনায় দক্ষ তাহা প্রমাণিত করিতে হইবে। ভারতীয় সেনার সাহায্যে যদি ইংরেজ জর্ম্মাণীকে পরাস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর দাবী তাঁহারা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ অবশ্যই একথা বলেন যে, 'ইংরেজ যদি এখনই

আমাদিগকে স্বরাজ না দেন, তবে জয় লাভের পর কখনই উহা দিবেন না।' সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকগণের প্রতি এরূপ অবিশ্বাস পোষণ করা অন্যায়। পরিণামে ভারতবর্ষের দাবী সফল হইবেই; আর আমরা যখন স্বরাজ চাই, তখন সাম্রাজ্যকেও সাহায্যকরা চাই-ই চাই। এই সাহায্যের ফল ভারতবাসীর অবশ্য প্রাপ্য। আমরা যদি সদুদ্দেশ্যে সরকারের সহায়তা করি, তাহা হইলে নিশ্চিতই সরকারের নিকট সদ্ব্যবহার পাইব।"

শুধু ঘোষণা প্রচার করিয়া মহাত্মা গান্ধী নীরব রহিলেন না। তিনি অসীম উত্তমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া প্রজাদিগকে সকল কথা বুঝাইতে লাগিলেন। সত্যসেবী মহাত্মা স্পষ্ট ভাষায়ই এ সময়ে বলিলেন যে, "ভারতবাসীর দুর্ব্বলতায় শত্রুরা যদি ভারত দখল করে, তাহা হইলে এদেশের ত্রিশকোটী লোককে কাপুরুষ করিয়া রাখার জন্য ইংলণ্ডকে অভিসম্পাতের ভাগী হইতে হইবে। ইংলণ্ডের সহায়তা ছাড়া ভারতের দাঁড়াইবার শক্তি নাই; কাজেই এখন ইংলণ্ডের আহ্বানে অগ্রসর না হইলে শেষে আর ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার কাছে কিছু দাবী করিবার থাকিবে না।

মহাত্মাজীর চেষ্টা সফল হইল—তিন দিনের মধ্যে তিনি ৩,৩৫৫ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিলেন। ভারতবাসীরা যে শৌর্য্যবীর্য্যে জগতের কোনজাতির অপেক্ষা হীন নহে, তাহা প্রমাণিত করাই মহাত্মা গান্ধীর একটা প্রধান উদ্দেশ্য; এই সুযোগে তিনি পৃথিবীর বীর জাতিদিগের কাছে ভারতবাসীদিগকে পরিচিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার উত্তম সফল হইল।

এদিকে ভারতবর্ষ অন্য এক কারণে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ব্যাপারটা 'রাউলাট্ আইন'। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বিলাতে "রাজ্যরক্ষা আইন' নামে একটা কঠোর আইন জারি হয়। তাহার উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষ

দেশের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র করিলে তাহা ব্যর্থ করা। বিলাতে এই আইন কিছুকালের জন্য প্রচলিত করা হয়। ভারতসরকারও এই সময়ে ঐরূপ একটা আইন প্রচলিত করেন—তাহার নাম "ভারতরক্ষা আইন।" যতদিন যুদ্ধ চলিবে তাহার পরও ছয়মাস পর্য্যন্ত এই আইন বহাল থাকিবে, এই সর্ত্তে ভারতরক্ষা আইন পাশ হইল। আইনের বলে গভর্ণমেণ্ট যে কোন লোককে সন্দেহ করিয়া বিনাবিচারে যতদিন ইচ্ছা আটক রাখিতে পারিবেন; যাহাদের নামে মামলা হইবে তাহাদের বিচার স্পেশাল আদালতে হইবে, স্পেশাল আদালতের বিচারের উপর আর আপীল চলিবে না। ভারতরক্ষা আইনের ইহাই মোটা কথা।

এই ভারতরক্ষা আইন অনুসারে বহুব্যক্তিকে আটক করা হইল, বহু লোককে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশি। আটক আসামীরা অনেকে নাখাইয়া মরিল—কেহ বা পাগল হইয়া গেল। চারিদিকে এ ব্যাপার লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিল।

গভর্ণমেণ্ট এই সময়ে একটা তদন্ত সমিতি গঠন করিয়া প্রকৃত ব্যাপারের সন্ধানে উদ্যত হইলেন। বিলাতের কিংস্‌বেঞ্চের—সুপ্রসিদ্ধ বিচারক রাউলাট্ সাহেব সমিতির নেতা হইলেন। এজন্য ইহার নাম হইল রাউলাট্ কমিটি। কমিটী, নানা কাগজপত্র দেখিয়া একটা মস্ত রিপোর্ট লিখিলেন। এই সময়ে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইল—সন্ধিপত্রেও স্বাক্ষর দেওয়া হইল।

সর্ত্ত অনুসারে ভারতরক্ষা আইন তুলিয়া দিবার কাল আসিতে লাগিল। আইন উঠিয়া গেলে, উহার বলে যাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছিল তাহাদিগকে কাজে কজেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের তাহা ইচ্ছা নহে—তাঁহারা আটক আসামীদিগকে ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং

রাউলাট্ কমিটীর রিপোর্ট অনুসারে নূতন দুইটী আইন পাশ করিলেন। এই নূতন আইনের কঠোরতার আলোচনা করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ব্যবস্থাপকসভার দেশীয় সদস্যগণ প্রাণপণে উহার প্রতিবাদ করিলেও কর্তৃপক্ষ উহা পাশ করিলেনই। তবে গভর্ণমেণ্ট কেবল এইটুকু স্বীকার করিলেন যে—এই আইন রাজনীতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে না—তিনবছরের বেশী বহাল থাকিবে না।

এই ভারতব্যাপী প্রতিবাদের আন্দোলনের সময়—মহাত্মা গান্ধী, ন্যায় ও স্বাধীনতার রক্ষাকল্পে উহাতে যোগ দিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন কিছুতেই দেশবাসী কোটী কোটী লোকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আইন পাশ করিলেন, তখন তিনি "সত্যাগ্রহ" প্রচার করিলেন। তদুপলক্ষে তিনি স্পষ্টই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বলিলেন যে—"এই আইন দুইটী দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা ও জন্মগত অধিকার ধ্বংস হইবে—উহা নিতান্তই অন্যায়মূলক। প্রত্যেক ব্যক্তির যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহার উপরই জাতি ও রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে। কাজেই যতদিন এই আইন বজায় থাকিবে—ততদিন আমরা উহা, এবং আবশ্যকমত অন্যান্য আইন মানিব না। কিন্তু আমরা কখনই সত্য ছাড়িব না বা অত্যাচার করিব না। বোম্বায়ের মিঃ প্যাটেল, মিঃ হর্নিমান, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, যমুনাদাসদ্বারকাদাস প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধীর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সত্যগ্রহ করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে আন্দোলনের একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল।

বড়লাট সাহেব মহাত্মা গান্ধীকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সহিত বড় লাটের কি কথোপকথন হইল, তাহা আর জানা গেল না। মহাত্মাজী ফিরিয়া আসিয়া প্রবলভাবে সত্যগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে সরকার যে সকল পুস্তক বাজেআপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল পুস্তক ছাপাইয়া স্বয়ং বোম্বাই নগরের রাজপথে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। অন্যায়-মূলক আইন অমান্য করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। মহাত্মা গান্ধীর আদেশে ৩০শে মার্চ্চ সত্যাগ্রহ পালনের দিন স্থির হইল—ঐদিন সকলে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য বন্ধ রাখিয়া পূজা উপাসনাদ্বারা ভগবানের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিবেন বলিয়া স্থির হইল। এই উপলক্ষে দিল্লীতে ভীষণ কাণ্ড ঘটিল—পুলিশের হাতে বহু নিরীহ লোক হতাহত হইল।

এই ঘটনার দশদিন পর মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পঞ্জাব সরকার তাঁহাকে দিল্লীতে যাইতে দিলেন না, পথিমধ্যে ট্রেণ হইতে নামাইয়া বোম্বাই পাঠাইয়া দিলেন। এই খবর প্রকাশ পাওয়া মাত্র কলিকাতা, পঞ্জাব ও আমেদাবাদে ভয়ানক উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চারিদিকে তুমুল আন্দোলন এবং হরতাল আরম্ভ হইল।

এই হরতাল্ উপলক্ষে কলিকাতা, আমেদাবাদ ও পঞ্জাবে অতিবড় দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরীহ নগরবাসীরা গোরার গুলিতে হতাহত হইল। পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটা সভাক্ষেত্রেই বহুশত লোককে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হইল। যাহাহউক, সাধারণ লোক সত্যাগ্রহের মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অনর্থক প্রাণ দিতেছে দেখিয়া, মহাত্মা গান্ধী উহা বন্ধ করিলেন এবং বৃথা প্রাণহানি ও দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনদিন উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সব গোলযোগ থামিয়া গেল।

বাহিরের গোলযোগ থামিলেও ভিতরের আন্দোলন থামিল না। জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎসকাণ্ডের কাহিনী সংবাদপত্রে ও জননায়কগণের মুখে প্রকাশ পাইয়া বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। দেশের লোক সে সংবাদে বিস্ময়ে—ক্ষোভে ও রোষে অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, ক্রমে সে সংবাদ বিলাতের পার্লামেণ্টে পৌঁছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ভীষণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিল, অন্যান্য সহরেও সামরিক আইন জারি করিয়া বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জন-নায়ককে লাঞ্ছিত—পরিশেষে নির্ব্বাসিত করা হইল। অত্যাচারের ফলে পঞ্জাববাসীরা অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বড় দিনের বন্ধের সময় এই অত্যাচারপীড়িত পঞ্জাবের অমৃতসরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইল। তাহাতে অত্যাচারের ভীষণতার কথা বিশেষভাবে আলোচিত ও প্রকাশিত হইল। এই কাহিনীর আলোচনা ও আন্দোলনে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য যে তদন্তকমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন—সেই কমিটীর কার্য্য-কলাপে দেশবাসী তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না বলিয়া, আন্দোলনের বেগ একটুকুও কমিল না; বরং মহাসমিতির পক্ষ হইতেও স্বাধীনভাবে তদন্ত করিবার জন্য দেশবাসীরা একটা কমিটী গঠন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। অমৃতসরের কংগ্রেসে সহযোগিতা-বর্জ্জন সম্বন্ধে আলোচনা হইল—কিন্তু কিছু স্থির হইল না। তখন ১৯২০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় একটা স্পেশাল্ কংগ্রেস করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ যে অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই সমিতির নাম "হাণ্টার কমিটী," কেন না মিঃ হাণ্টার উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কংগ্রেস পক্ষ হইতেও পৃথক্ ভাবে একটা অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়া তদন্ত চলিতে লাগিল। সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের তদন্তের কাহিনী পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল—লোকে তাহা পড়িয়া বুঝিল যে, জগতে এমন পৈশাচিক কাণ্ড আর একটীও ঘটে নাই।

এই সকল ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই খিলাফৎ ব্যাপার লইয়া মুসলমান সমাজে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেন না ভারতের মুসলমানগণ তুরুষ্কের (রুমের) বাদশাহকে আপনাদের ধর্ম্মের নেতা বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহারা তুরুষ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তারপরে যখন বলা হয় যে, "যুদ্ধের পূর্ব্বে তুরুষ্কের অবস্থা যেরূপ ছিল, যুদ্ধের পরও তেমনি থাকিবে" তখন মুসলমানেরা ইংরেজের পক্ষ হইয়া রুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়াছিল। যুদ্ধের পরে যখন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হইল না, তখন মুসলমানেরা অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিল; কতকগুলি মুসলমান ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া কাবুল অঞ্চলে আশ্রয় লইতে লাগিল। তাহারা আর ইংরেজের সংশ্রবে বা তাহার রাজ্যেও বাস করিতে চাহিল না। মহাত্মা গান্ধী এই ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন—সরকারের সহিত সহযোগিতা না করাই যে আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষার প্রকৃষ্ট পথ, দৃঢ়তার সহিত তাহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

খেলাফতের ব্যাপার উপলক্ষে এই যে সহযোগিতা-বর্জ্জনের কথা আরম্ভ হইল, উহা ক্রমে প্রবলভাব ধারণ করিতে লাগিল—ভারতের সর্ব্বত্র উহার আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের জনগণকে এবিষয়ে আলোচনা করিতে দেখিয়া জাতীয় মহাসমিতির দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

অমৃতসর কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে ১৯২০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেস বসিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। এদিকে মহাত্মা গান্ধী মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিয়া সহযোগিতা-বর্জ্জন কেন কর্ত্তব্য, সে কথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলেন—কিন্তু লুকাইয়া; যে দিন তাঁহার আসিবার কথা ছিল, সে দিবস জনমণ্ডলী হাওড়া ষ্টেশন হইতে হ্যারিসন রোড্ পর্য্যন্ত সমুদয় রাত্রি তাঁহার দর্শনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থান করিয়াছিল। পলাইয়া লুকাইয়া আসিয়াও কিন্তু তিনি অভ্যর্থনার হাত এড়াইতে পারেন নাই। ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রি ১১॥০টায় তাঁহাদের গাড়ী হাবড়ায় আসে—সঙ্গে সৌকৎ আলী ও ডাঃ কিচলু ছিলেন। প্রায় পঁচিশ হাজার লোক মহাত্মাজীর শোভা-যাত্রায় যোগ দিয়াছিল। রাত্রি তিনটাতে শোভাযাত্রা তাঁহাকে বাসাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। দেশের জনসাধারণ মহাত্মাজীকে কি চক্ষে দেখে, উপরি উক্ত ব্যাপারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেস বসিল। পঞ্জাবের পৈশাচিক ব্যাপার, খিলাফতের বিষয় এবং শাসন-সংস্কারের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইল। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হইল। কমিটী দেশবাসীকে যে ভাবে উহা পালন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা এইরূপ:—(১) পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন ও সহযোগিতা-বর্জ্জনের বিষয়ে নির্ব্বাচনের অধিকারীদিগকে সুশিক্ষিত করা। (২) জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন। (৩) সালিসী বিচারালয় প্রতিষ্ঠা। (৪) সরকারী উপাধি এবং অবৈতনিক চাকরী ত্যাগ। (৫) সরকারী দরবার প্রভৃতিতে যোগ না দেওয়া। (৬) শ্রমিকদিগকে ট্রেড্ ইউনিয়নের অধীন করা। (৭) ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় হইতে ক্রমে ক্রমে মূলধন ও শ্রমিক তুলিয়া লওয়া। (৮) ভারতবাসী-দিগকে সরকারী কর্ম্ম লইয়া ভারতের বাহিরে যাইতে নিষেধ করা। (৯) স্বদেশী গ্রহণ। (১০) তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার নামে একটী

জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপন—উহার জন্য ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা। মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মপটুতা, অকপটতা ও ঐকান্তিকতায় দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে—দেশের জনসাধারণ জাগিয়া উঠিতেছে—সহকারিতা-বর্জ্জন ক্রমেই দৃঢ়তা ও গাঢ়তা লাভ করিতেছে।

কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হইলে মহাত্মাজী আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। এই সময়ে চম্পারণ জিলায় প্রজাদের ও পুলিশের মধ্যে বিষম গোলযোগ ঘটে ; তিনি সেই সকল স্থানে গমন করিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য চেষ্টা করেন। সাহাদাৎপুর নামক স্থানের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত মহাত্মাজীকে জানায় যে, পুলিশ স্ত্রীলোকদিগকে ঘর হইতে টানিয়া লইয়া প্রহার করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বৃত্তান্তে বুঝা যায় যে, পুলিশ গায়ে পড়িয়া প্রজাদের সহিত বিবাদ করিয়াছিল। যাহা হউক, তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এবারও তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা হইতে ঢাকায় উপস্থিত হন—তাঁহাকে দেখিবার জন্য সুদূর পল্লীগ্রাম হইতেও দলে দলে লোক ঢাকায় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সকলকে বর্জ্জননীতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন।

১৯২০ সনের কংগ্রেস নাগপুরে বসিল। মহাত্মা গান্ধী সদলবলে কংগ্রেসে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তথায় ছাত্র-কনফারেন্স নামে একটা সভা বসে ; ভারতের চারিদিক হইতে বহু কলেজের ছাত্র এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলন ক্রমেই গভীরভাব ধারণকরিতেছে, খেলাফৎ ও পঞ্জাবের পাশব অত্যাচারে দেশের জনসাধারণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ দাবী করিতেছে, এ সকল কথা বিলাতেও প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বিলাত হইতেও কয়েক ব্যক্তি

এই বারের কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। মিঃ বিজয় রাঘব আচারিয়া কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার মহাসমিতির উদ্বোধন হইয়াছিল।

এবারকার কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহাতে বলা হয় যে,—"আইনসঙ্গত ভাবে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বরাজ লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।" কেহ কেহ এই প্রস্তাবের সহিত বৃটিশ গণতন্ত্রের সহায়তার কথা যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মাজী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না বরং তিনি স্পষ্ট কথায় বলিলেন "ভারতবাসী সমর্থ হইলেও যে চিরকালই ইংরেজের অধীন হইয়া থাকিবে এমন কল্পনার ন্যায় আত্ম-সম্মান-হানিকর কল্পনা আর হইতেই পারে না।" মহাত্মার প্রস্তাবই কংগ্রেসে গৃহীত হইল।

মহাত্মা গান্ধী কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসে যে সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নাগপুরের মূল কংগ্রেসেও সেই প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, প্রস্তাব করিলেন দেশমান্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। প্রস্তাবটীর স্থূলমর্ম্ম এইরূপ—(১) দেশবাসী বর্ত্তমান ভারতসরকারকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, (২) তাহারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ় অভিলাষী, (৩) কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেকার সময় পর্য্যন্ত দেশবাসী তাহাদের জন্মগত স্বার্থ ও অধিকার পাইবার জন্য যত কিছু চেষ্টা করিয়াছিল সে সকল বিফল হইয়াছে, বিশেষতঃ পঞ্জাব ও খেলাফতের ব্যাপারে তাহারা প্রতিকারের জন্য যে কিছু চেষ্টা করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। এই জন্যই কংগ্রেস, সরকারের সহিত কোন সহযোগিতা করিতে রাজি নহেন, অধিকন্তু আবশ্যক হইলে সরকারকে খাজানা দেওয়াও বন্ধ করিতে হইবে।" মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন, প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কংগ্রেসের পর বোম্বাইয়ের টাইমস্ নামক ইংরেজ পরিচালিত সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি, মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক বিষয়ের আলোচনা করেন। আলোচনার উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, "ইংরেজ যদি এখনি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভারত কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে তাহা নহে—তাহারা সর্ব্ব প্রকারের আপদ্ বিপদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে। আর ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে সিংহ, মেষের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবেন।"

এই সময়ে ১০ই জানুয়ারী সম্রাটের খুল্লতাত ডিউক অব্ কনট্ ভারতে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে দেশবাসীর মনের দুঃখ জানাইবার জন্য, তিনি যে যে স্থানে গমন করেন—তথায় সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব অনুসারে হরতাল হয়—দোকান পাট গাড়ী ঘোড়া ট্রাম চলাচল প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়। চারিদিকে ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছাড়িতে লাগিল। এ বিষয়ে বঙ্গ দেশের ছাত্রেরাই অগ্রণী হইল। মহাত্মা গান্ধী ইহাতে বিশেষভাবে উৎসাহ দিলেন এবং স্কুলগুলি যাহাতে জাতীয়ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এবং ভারতের ঘরে ঘরে যাহাতে চরকায় সূতা কাটা হয়—সেজন্য সকলকে দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

২৮শে জানুয়ারী ডিউক অব্ কনট্ কলিকাতায় আসিলেন। তৎপূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী এখানে আসিয়াছিলেন। বঙ্গীয় খেলাফৎ কমিটী ও কংগ্রেস কমিটীর নির্দ্দেশ মত ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতায় বিরাট হরতাল হইল, সমস্ত যান-বাহন-দোকান-পাট, হাট-বাজার-কাজ-কর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ডিউকের অভ্যর্থনায় বা মিছিলে কয়েকটী সরকারী লোক ছাড়া কেহ বড় যোগ দিল না। কলিকাতা যেন শোকচিহ্ন ধারণ করিল।

২রা ফেব্রুয়ারী বুধবার ডিউক অব্ কনট্ নূতন কাউন্সিলের উদ্বোধন

করিলেন। কলিকাতার অধিবাসীরা ৮টী বিরাট সভা করিয়া উহার অসারতা ব্যক্ত করিলেন। ঐ সকল সভার মধ্যে মির্জ্জাপুর বাগান, ওয়েলিংটন বাগান, কলেজ স্কোয়ার, বীডন বাগান ও ভবানীপুরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া—মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মৌলানা মহম্মদ আলী শ্রোতৃবর্গকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। মহাত্মাজী শুক্রবারে কলিকাতায় জাতীয় "বৈদ্য-পীঠ" নামে চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে ঝরিয়া হইয়া পাটনায় গেলেন; ৭ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় কলেজের উদ্বোধন করিলেন।

কলিকাতায় থাকিতেই মহাত্মা গান্ধী ডিউক্ অব্ কনট্‌কে একখানা খোলা পত্র লিখেন। তাহার মর্ম্ম ১৩২৮ সনের ২৫শে মাঘের নায়ক হইতে উদ্ধৃত করিলাম—"ডিউক মহোদয়! আপনি নন-কো-অপারেশন, নন-কো-অপারেশনকারী ও তাহাদের কার্য্য প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রবক্তা এই অধমের কথা অনেক শুনিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার শঙ্কা হইতেছে যে আপনাকে এই সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এক পক্ষের কথা সুতরাং আমার বন্ধুবর্গের এবং আমার প্রতি কর্ত্তব্যপালনার্থে আমাদের পক্ষ হইতে নন-কো-অপারেশনের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য বিবৃত করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করিতেছি। আমি ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি এই ভাবের নন-কো-অপারেশনেরই অনুবর্ত্তন করি।

আপনি আমাদের দেশে আসিয়াছেন, আপনাকে বর্জ্জন করাতে আমি আনন্দ অনুভব করি নাই। আমি ত্রিশ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত সরকারের সহিত সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐরূপ করিলেই আমরা স্বাধীনতা পাইব। সুতরাং আপনার অভ্যর্থনায় আমরা একেবারেই যোগ দিব না, একথা আমার পক্ষে বলা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার

নহে। আপনি একজন ইংরেজ ভদ্রলোক। আপনার উপর আমাদের কাহারও কোনরূপ আক্রোশ নাই।

আমরা আমাদের একজন প্রিয় বন্ধুকে যেরূপ পবিত্র মনে করি, আপনাকেও সেইরূপ পবিত্র মনে করি। কোন ইরেজের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের বিরোধ নাই। আমরা ইংরেজী জীবনকে নষ্ট করিতে চাহি না। কিন্তু যে পদ্ধতিতে দেশের দেহ মন ও আত্মাকে ক্লীবত্ব প্রদান করিয়াছে, তাহাই নষ্ট করিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিয়াছি। ইংরেজের যে ভাবের ফলে পঞ্চনদে ওডায়ার ও ডায়ারের মত লোকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, ইংরেজের যে ভাবের ফলে সাত কোটী ভারতবাসী যে ধর্ম্মের সেবা করে, সেই ইসলাম ধর্ম্মের ঘোর অবমাননা করা হইয়াছে, সেই ভাবের বিরুদ্ধে আমরা সর্ব্বশক্তি দিয়া সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় গম্ভীরভাবে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার ভাবের ও ভাষার অপহ্নব ঘটাইয়া এই অবমাননা করা হইয়াছে। যে প্রাধান্য ও গর্ব্ব অনেক গুরুতর বিষয়ে ত্রিশ কোটী নিরীহ ভারতবাসীর মনোভাবকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহা আর অধিক দিন সহ্য করা আমাদের আত্ম-সম্মানের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেছি। ভারতের ত্রিশকোটী নরনারী অনুক্ষণ এক লক্ষ ইংরেজের নিকট জীবনভয়ে অবনত ও বশীভূত থাকিবে, ইহা আমাদের পক্ষে হীনতাদ্যোতক এবং আপনাদের পক্ষেও গর্ব্বের বিষয় নহে।

আমি যে পদ্ধতির বর্ণনা করিলাম, আপনি সেই পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধন করিতে আইসেন নাই, উহার সম্ভ্রম রক্ষাকরিবার জন্যই আসিয়াছেন। আপনি প্রথমেই লর্ড উইলিংডনকে প্রশংসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জানি, আমার বিশ্বাস তিনি একজন সাধু ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি সামান্য একটি পোকা মারিতেও ইচ্ছা করেন না। কিন্তু শাসনকার্য্যে

তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখাই যাহাদের স্বার্থ, তিনি তাহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছেন। দ্রাবিড়ী দেশের লোকের মনোভাব তিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। বাঙ্গালাতে আপনি এখানকার শাসকের গুণ ব্যাখ্যান করিতেছেন, আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি ইনি একজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক; কিন্তু ইনি বঙ্গবাসীর হৃদয়ের ও আকাঙ্ক্ষার সহিত কিছুমাত্র পরিচিত নহেন। কলিকাতা বাঙ্গলা নহে। ফোর্ট উইলিয়াম ও কলিকাতার প্রাসাদাবলি এই সুন্দর দেশের মার্জ্জিতবুদ্ধি ও বিদ্বেষের অস্ফুটধ্বনিবিবর্জ্জিত কৃষীবলের ধনাদি উদ্ধতভাবে আত্মসাৎ করণের নিদর্শন মাত্র। যে শাসনসংস্কার ভারতের দুর্দ্দশার ও অপমানের উপর একটু জৌলুস চড়াইয়া দিতেছে মাত্র, নন-কো-অপারেশন ওয়ালারা তাহাতে ভুলিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তাঁহারা তাই বলিয়া অধীর বা ক্রুদ্ধও হইবে না। আমরা অধৈর্য্যমূলক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতাদ্যোতক হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইব না। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আমাদের যে টুকু নিন্দা প্রাপ্য তাহা আমরা লইতে প্রস্তুত। আমাদের স্বেচ্ছাকৃত সাহচর্য্য আমাদের অধীনতার যতটা কারণ মনে করি, ইংরেজের কামান আমাদের অধীনতার ততটা কারণ নহে।

আপনার উপর আমাদের ব্যক্তিগত কোনরূপ প্রতিকূলতা আছে বলিয়া আমরা আপনার অভ্যর্থনায় যোগদান করি নাই, একথা ঠিক নহে। আপনি যে পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আসিয়াছেন, সেই পদ্ধতির সহিতই আমাদের যত বিরোধ। আমি জানি, ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ইংরেজ ইচ্ছা করিলেও সহসা তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। আমরা ইংরেজের সমান হইতে চাহি, আমরা ইংরেজ-ভীতি পরিহার করিবই করিব। আমরা আত্ম-নির্ভরশীল হইতে শিক্ষা করিব। আমরা যে

সরকারের সংশোধন না হইলে তাহার বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, সেই সরকারের বিদ্যালয়, আদালত, রক্ষা, অভিভাকতা প্রভৃতিতে আর নির্ভর করিব না, এই জন্যই এই অহিংসাত্মক অসাহচর্য্য নীতি অবলম্বন করিয়াছি। আমি জানি আমরা বক্তৃতায় ও কার্য্যে সম্পূর্ণ প্রচণ্ডভাব বর্জ্জিত হইতে পারি নাই,—কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিত বলিতেছি যে, উহাতে অতিবিস্ময়কর ফল ফলিয়াছে। লোকে অহিংসা ভাবের গূঢ় রহস্য এখন যেরূপ বুঝিয়াছে, এমন আর কখনই বুঝে নাই। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্ম্মসম্পর্কিত আত্মশুদ্ধি-সাধক আন্দোলন। আমরা মদ্যপান ও জল অনাচরণীয়তা বর্জ্জন করিতেছি। আমরা বিদেশী জাঁকজমকবিশিষ্ট বিলাস দ্রব্য বর্জ্জন করিতেছি; চরকার প্রবর্ত্তনা করিয়া প্রাচীন কবি-কথিত সরলতাকে বরণ করিতেছি। এই প্রকারে আমরা বর্ত্তমান অনিষ্টজনক প্রতিষ্ঠানকে নিষ্ফল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি আপনাকে এই আন্দোলনের বিষয় এবং ইহা সাম্রাজ্যের ও পৃথিবীর উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে, তাহা বুঝিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। যাহা কিছু ভাল, তাহার সহিত আমাদের বিরোধ নাই। ইসলামকে রক্ষা করিয়া আমরা সকল ধর্ম্মকেই রক্ষা করিব। ভারতের সম্মান রক্ষা করিয়া আমারা সমগ্র মানবজাতির সম্মান রক্ষা করিব। আমাদের উপায় কাহারও হানিজনক নহে। আমরা ইংরেজের সমকক্ষ-বন্ধুভাবে থাকিতে চাহি, সেই বন্ধুত্ব কথায় ও কাজে তুল্যমূল্য হইবে। আমরা যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিব, ততদিন নন্‌-কো-অপারেশন করিব, আমাদিগকে পবিত্র করিব।

আশা করি, আপনি এবং প্রত্যেক ইংরেজ নন্‌-কো-অপারেশনের এই নূতনভাব উপলব্ধি করিবেন।

(স্বাক্ষর) এম গান্ধী।

ইহার পর তিনি লক্ষ্ণৌ হইয়া ১২ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পৌঁছিলেন। মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য নানা দূরবর্ত্তী স্থানহইতে লক্ষ্ণৌতে প্রায় ৭৫ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। লালা লজপৎ রায়, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও এই সময়ে মহাত্মাজীর সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, দিল্লীতে একটী হাকিমী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ নগরে যে খেলাফৎ সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বক্তৃতাকালে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, "আগামী অক্টোবর মাসের আগে সাত মাসের মধ্যেই আমরা খেলাফৎ সমস্যার মীমাংসা করিয়া স্বরাজ লাভ করিব। * * * * প্রথম প্রথম আমাদের কথা শুনিয়া বড়লাট সাহেব বিদ্রূপের হাসি হাসিতেন, এখন কিন্তু তিনিই আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিতেছেন। বিলাতী দ্রব্য বয়কট ও কাপড় বর্জ্জন করিলেই অতি অল্পদিনের মধ্যে আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব।

মহাত্মা গান্ধীকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে, যে সকল উকিল আদালত ছাড়েন নাই বা কলেজের ছাত্র কলেজ ছাড়েন নাই, তাহাদের কর্ত্তব্য কি? এই প্রশ্ন ছিল। মহাত্মা তদুত্তরে লিখিয়াছেন যে,—"উকিলেরা, উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা দেশের কার্য্যের সহায়তা, দালালের সংশ্রব ত্যাগ, সালিসী দ্বারা মামলার নিষ্পত্তি, অবসর সময়ে দেশের কাজ, ওকালতীতে অসাধুতা ত্যাগ, স্বয়ং বা পরিজন দ্বারা দুই এক ঘণ্টা চরকী চালান, বিলাসিতা ত্যাগ, প্রভৃতি বহু কাজ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা রাজনীতিতে যোগ বা নেতৃত্ব করিতে পারিবেন না। ছাত্রেরাও অর্থে ও সামর্থ্যে দেশের কাজ করিতে পারেন।"

(১০)

গত ১লা এপ্রিল বেজওয়াদায় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। সহযোগিতা বর্জ্জন যে দৃঢ়তরভাবে চালাইতে হইবে—কমিটী সে প্রস্তাব গ্রাহ্য

করিয়াছেন। তবে আপাততঃ খাজানা দেওয়া বন্ধ করা হইবে না বলিয়া কমিটী মত স্থিরকরিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এখানেও কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী ও শ্রমিকগণ মহাত্মাকে অভিনন্দন পত্র দিয়াছিল। এই তারিখেই ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড রেডিং ভারতের বোম্বাই নগরে অবতরণ করিয়া শাসনভার গ্রহণ করেন।

লর্ড রেডিং নূতন লোক বলিয়া, মহাত্মাজীর অভিমত অনুসারে কোথাও আর হরতাল হয় নাই। বেজওয়াদার কংগ্রেস কমিটীতে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সরকার যে ভাবে সহযোগিতা বর্জ্জনকারীদিগের প্রতি আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে আইন অমান্য করিয়া চলা উচিত।" কিন্তু দেশের লোকেরা এখনো দৃঢ় সংকল্পী হয় নাই, সুতরাং এখন তিনি আইন লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রচার করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা ৩০শে জুনের মধ্যে যদি এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া "তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে" জমা দিতে পারেন, তাহা হইলে সহজে ও অনতিবিলম্বে স্বরাজ লাভ-করিতে পারা যাইবে। মহামতি লোকমান্য তিলক স্বরাজ্য লাভকরিবার জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাই জাতীয় মহাসমিতি স্বরাজ্য লাভের প্রথম ও প্রধান উপকরণটীতে সেই মহাপুরুষের নাম দিয়াছিলেন।

তিলক-স্বরাজ্যভাণ্ডারের টাকার জন্য মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীর কাছে আবেদনপত্র প্রচারকরিলেন এবং স্বয়ং টাকা সংগ্রহের জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে বহু টাকা ও অলঙ্কার সংগ্রহ করিলেন, নানা স্থানে সভাসমিতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। এখানে লালা লাজপৎ রায় তাঁহার সহায় হইলেন।, তাঁহাদের চেষ্টায় তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে ক্রমে ক্রমে বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল।

যুক্তপ্রদেশের নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় একটু অসুস্থ হইয়া সিমলা পাহাড়ে ছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে সিমলা যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহাত্মাজী তথায় উপস্থিত হইয়া মালব্য মহোদয়ের কাছে শুনিতে পান যে, ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড রেডিং বাহাদুর মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক। তদনুসারে মহাত্মাজী বড়লাটের সহিত ক্রমান্বয়ে চারিবার দেখা করেন। প্রত্যেক বারেই বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিয়াছিল। কিন্তু কি কি বিষয়ে কিরূপ কথোপকথন হইল, তাহা সাধারণের মধ্যে অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই। জুন মাসের মাঝামাঝি এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

সিমলা হইতে মহাত্মাজী বোম্বাই অঞ্চলে চলিয়া যান এবং তিলক-স্বরাজ্য ভাণ্ডারের টাকা আদায়ের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ৩০শে জুনের মধ্যে এক কোটী টাকা সংগ্রহের কথা হইলেও মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোটে ২০।২৫ লক্ষ টাকা মাত্র সংগৃহীত হয়; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট তারিখে যাহাতে সঙ্কল্পিত টাকা সংগৃহীত হইতে পারে, সেজন্য ভারতের সর্ব্বত্র বিপুল উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ হইল।

চারিদিকে একটা কথা উঠে যে, বোলসেভিক্‌দিগের সহায়তায় আফ্‌গান জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। যদি সত্যসত্যই আফ্‌গানগণ ভারত আক্রমণ করেন, তাহা হইলে উঁহা-দিগকে যাহাতে অনায়াসে পরাস্ত করা যায় সেজন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা আবশ্যক। সুতরাং ভারতের জন্য যুদ্ধের উপযোগী বহুপ্রকার সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন। সে সকল স্থির করিবার জন্য সিমলায় একটা বৈঠক বসাইবার কথা হয়—ভারতের প্রধান সেনাপতি তাহার সভাপতি হইবেন বলিয়া স্থির হয়। আর ইহাও স্থির হয় যে, এ বিষয়ে ভারতের জননেতাদিগের মত গ্রহণ করা হইবে।

এতদুপলক্ষে সিমলা হইতে ভারতীয় নেতাদিগের কাছে এক নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। উহাতে মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎরায়, পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, হাকিম আজমল খাঁ ও হাসান ইমাম প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দেরও নিমন্ত্রণ হয়। অসহযোগী বলিয়া মহাত্মা গান্ধী এই সভায় যাইতে অস্বীকৃত হন।

মহাত্মা গান্ধী, সামরিক বৈঠকে যাইতে অস্বীকার করিলে অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিল যে, তিনিতো ইহার আগেও চারিবার বড়লাটের সহিত যাচিয়া দেখা করিয়াছেন, তবে আর এখন দেখা করিবেন না কেন? মহাত্মাজী কিন্তু এসকল অনুযোগ গ্রাহ্য করেন নাই—যথার্থ স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ লাভ না করিতে পারা পর্য্যন্ত তিনি সরকারের কোন সহায়তায় যাইতে রাজি নহেন।

ক্রমে ৩০শে জুন আসিল। সেদিন ভারতের পক্ষে একটা স্মরণীয় দিন। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোক যেন জাতীয় যজ্ঞের পূর্ণাহুতির জন্য প্রস্তুত হইলেন—ভারত ব্যাপিয়া সভার অধিবেশন হইল—তিলকস্বরাজ্যভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইল। ৩০শে জুন তারিখেও যাহার সাফল্য বিষয়ে সকলের হৃদয় সন্দেহ-দোলায় অতি মাত্র দুলিতেছিল—সেদিনকার সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিবৃত্ত হইল—মহাত্মাজী চারিদিক হইতে তারের সংবাদ পাইয়া জানাইলেন যে, ভাণ্ডারের জন্য যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ ১ কোটী ৫ পাঁচলক্ষ। সমগ্র ভারতব্যাপিয়া বিপুল আনন্দ কোলাহল উঠিল, বিরোধী দলের মুখে চুণ কালি পড়িল, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব কত তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

মহাত্মা গান্ধী ১লা জুলাই বোম্বাই নগরে এক সভা করেন। তাহাতে তিনি তিলকস্বরাজ্যভাণ্ডারের টাকার হিসাবের সহিত ইহাও বলেন যে, ভারতে এই দানের ব্যাপারে বোম্বাই যেমন অগ্রণী, তেমনি দেশী খদ্দর (হাতে বোনা দেশী কাপড়) ব্যবহারেও যেন বোম্বাই সকলের অগ্রণী থাকে। ঐ সভায় দালালগণ মহাত্মাজীকে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

মহাত্মাজী একটী চরকা উপহার পাইয়াছিলেন—এই সভায় সেইটীর নীলাম ডাক হয়। এক ব্যক্তি উহা দুই হাজার টাকা মূল্যে নীলামে কিনিয়া লইয়াছেন। আর এক ব্যক্তি এলফিন্‌ষ্টোন মিলের পাঁচটী অংশ তিলকস্বরাজ-ভাণ্ডারে দিয়াছিলেন, উহাও নীলামে তোলা হয়, অংশ কয়টী ২২ বাইশ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন যে, ৩০শে জুনের মধ্যে তিলকস্বরাজ্য-ভাণ্ডারে এককোটী টাকা সঞ্চিত করিতে পারিলে—কংগ্রেসের জন্য এক কোটী সভ্য সংগ্রহ ও দেশে পঁচিশ লক্ষ চরকা চালাইতে পারিলে স্বরাজ-লাভ সহজেই হইবে। মহাত্মার এই আবেদন যখন দেশবাসীরা পূর্ণ করিয়া দিল, তখন তিনি দেশবাসীর কাছে দ্বিতীয় আবেদন উপস্থিত করিলেন। সেই আবেদন বিদেশীয় বস্ত্র বর্জ্জনের।

কি কি কারণে বিবেশীয় বস্ত্র বর্জ্জন করা উচিত, মহাত্মা গান্ধী নিম্ন-লিখিতরূপ দশ দফায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন :—

(১) ইংরেজেরা এদেশে আসিবার আগে, আমাদের দেশের জন্য যত কাপড় দরকার হইত, তাহাতো আমরা তৈয়ার করিতামই, তা ছাড়া আরো বহু কাপড় বোনাইয়া বিদেশে চালান দিতাম।

(২) আমাদের দেশে ঘরে ঘরে চরকা চলিত, জোর করিয়া উহা বন্ধ করা হইয়াছিল। উহা বন্ধ হওয়াতে দেশের একশত লোকের মধ্যে

প্রায় আশিজনেরও বেশি লোকের একটা আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৩) বিদেশী কাপড় ছাড়িলে এবং দেশের তৈয়ারী কাপড় পরিলে স্ত্রীলোকদিগের পবিত্রতা রক্ষা পাইবে। ঘরে কোন কাজকর্ম্ম নাই—উপার্জ্জনের পথ নাই বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে এখন ঘরের বাহিরে যাইতে হইতেছে। ইহাতে তাহাদিগকে নানাপ্রকার বিপদে পড়িতে হইতেছে।

(৪) প্রাণশূন্য কলে তৈয়ারী কাপড়ের চেয়ে হাতে তৈয়ারী কাপড়ে অনেক বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় আছে।

(৫) কাজ পায়না বলিয়া উপার্জ্জনের অভাবে দেশের বহুলোক উপবাসে দিন কাটায়। দেশে আবার চরকা ও তাঁত ঘরে ঘরে চলিলে উহাদের দুর্দ্দশা কাটিবে—দরিদ্রতা ঘুচিবে।

(৬) প্রতি বছর বিদেশ হইতে এদেশে ষাইট কোটী টাকার কাপড় আমদানী হয়, বিদেশী কাপড় ছাড়িলে দেশের ঐ ষাট কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

(৭) বিদেশ হইতে বহুপ্রকার জিনিষের আমদানী হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদেশী কাপড়েই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করিয়াছে।

(৮) গত বছর—১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ১৫০ কোটী টাকার মাল এদেশে আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে কাপড় ষাইট কোটী টাকার—অর্থাৎ তিন ভাগেরও বেশী, তারপরই চিনি, উহার মূল্য বাইশ কোটী টাকা।

(৯) বিদেশ হইতে কাপড় আমদানী করা হয় বলিয়াই, ইংরেজ জাতি স্বার্থপর হইয়াছে—এক্ষণে জাপানও স্বার্থপর হইতেছে। জাপান হইতে যদি বহুকাল ধরিয়া কাপড় আমদানী করা হয়—তাহা হইলে—এক্ষণে

আমরা ইংরেজের কাছে যেমন একেবারে অধম হইয়া পড়িয়াছি, জাপানের কাছেও তেমনি অধম হইয়া পড়িব।

(১০) অন্নের জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইলে যেমন প্রকারান্তরে আত্মহত্যা করা হয়—বস্ত্রের জন্য পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইলেও ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের পক্ষে সেইরূপ আত্মহত্যাই করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী জুলাই মাসের প্রথমেই দেশের বস্ত্রব্যবসায়ী ও দেশবাসীদিগকে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইতে এবং ১লা আগষ্ট—লোকমান্য মহামতি তিলকের জন্মতিথি উপলক্ষে—বিদেশী বস্ত্র পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে বলেন। ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের অনেক বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ী উহার আর আমদানী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাত্মা গান্ধী শুধু নামে "করমচাঁদ" নহেন, অনুষ্ঠানেও করমচাঁদ—কর্ম্মী; তিনি শুষ্ক উপদেষ্টা নহেন, আনুষ্ঠানিক আদর্শপুরুষ। বোম্বাইয়ের এক মহিলাসভায় বক্তৃতা করিবার কালে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী বলিলেন, খদ্দর কাপড় পরিয়া রান্নার কাজ করিতে আমার বড়ই কষ্ট হয়। উত্তরে আমি তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে, আমরা উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছি; এ বয়সে, খদ্দর পরিয়া রান্না করিতে যদি তোমার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তুমি উলঙ্গ হইয়া কিংবা একখানা গামোছা মাত্র পরিয়া রান্না করিবে। তবু অপবিত্র বস্ত্র পরিয়া আমার রান্নাঘরে যে তুমি ঢুকিবে তাহা আমি কোন মতেই সহিতে পারিব না। (সভায় উপস্থিত) আমার জননীদিগকেও আমি সে কথাই বলিতে চাই। আমার ন্যায় আপনারাও হৃদয় কঠিন করুন। ভারতবর্ষ এখন বিলাসের লীলাক্ষেত্র হইয়া

পড়িয়াছে। আমাদের ঋষিরা বলিতেন, 'ভারতবর্ষ পবিত্র কর্ম্মভূমি।' যদি আপনারাও সে কথা মনে করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকেও সেই অনুসারেই চলিতে হইবে। উহা আর কিছুই নহে—কেবল দেশীয় কাপড় পরিতে হইবে।

উপযুক্ত পরিমাণ দেশীয় বস্ত্রের অভাব জন্য বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করা অসম্ভব বলিয়া অনেকে আপত্তি করিতেছেন—তাহা শুনিয়া মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে,—"এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে আমাদিগকে অর্দ্ধেক বস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে অথবা কাপড়ের অভাব-ক্লেশ বা দুর্ম্মূল্যতা সহিতে হইবে। যতদিন ঘরে ঘরে চরকা না চলে, প্রত্যেক তাঁতী কাপড় বোনা আরম্ভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে কৃপণের মত স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।"

বিদেশী বস্ত্র বা মদ্যপান ত্যাগ করা কেন কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগকে উদ্দেশ করিয়া এবং তাহাদের সহায়তা চাহিয়া স্পষ্টভাষায়—খোলাখুলিভাবে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ;—

"ইতিহাস লেখক ইংরেজগণ প্রমাণ প্রয়োগের সহিত দেখাইয়া গিয়াছেন যে, জোর করিয়াই ভারতের লোকদিগকে লাঙ্কাশায়রের কাপড় পরিতে বাধ্য করা হয়—কাপড় পরিতে আরম্ভ করান হয়। এবং ভারতবর্ষের বিশ্ববিখ্যাত বস্ত্রশিল্প ইচ্ছা করিয়া নিয়মিত ভাবে নষ্ট করা হয়। সেই কারণেই আজ ভারতবর্ষকে কেবল লাঙ্কাশায়রের নহে—জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতির দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। শুধু কাপড়ের জন্যই আমরা প্রতি বছর অন্ততঃ ষাট কোটী টাকা বিদেশে পাঠাইয়া থাকি। অথচ ভারতের যত কাপড় দরকার, তাহা তৈয়ারী হইবার উপযুক্ত তূলা ভারতেই জন্মে। ভারতের উৎপন্ন তূলা বিদেশে পাঠাইয়া

সেই তুলায় কাপড় বোনান হয়—সেই কাপড়ই ভারতে আমদানী করা হয়! ইহার মত পাগ্‌লামী আর কি হইতে পারে? ভারতবর্ষকে এইরূপভাবে অসহায় অবস্থায় পরিণত করা কোনরূপেই ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

দেড়শ বছর আগে আমরাই আমাদের সমুদয় কাপড় তৈয়ার করিয়া লইতাম। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ঘরে বসিয়া অতিশয় সরুস্থতা কাটিতেন। তাহাতে তাহাদের একটু বেশ আয় হইত। গ্রামে গ্রামে তাঁতীরা সেই গৃহস্থের তৈয়ারী সূতাদ্বারাই কাপড় বুনিত সুতরাং তাহা-দিগকে আর উপার্জ্জনের জন্য ভাবিতে হইত না। ভারতবর্ষ অতি বিরাট দেশ—তাহার অধিবাসীদিগকে আবার কৃষিকার্য্যের উপরও নির্ভর করিতে হয়। এমতাবস্থায় সেদেশে এভাবে অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। এরূপ না করিলে এত বড় দেশের অর্থসমস্যার মীমাংসা করার উপায়ই নাই। এই প্রাচীন ব্যবস্থাটীর ফলে আমরা আমাদের অবসর সময়টুকু বেশ স্বাভাবিক উদ্দেশ্যেই খাটাইয়া লইতাম।

"এই ব্যবস্থাটী উল্টাইয়া দেওয়াতে আমাদের দেশের জননী-ভগিনীরা এখন আর চরকা চাসান না সুতরাং সূতাকাটার কলাকৌশলটুকু ভুলিয়া গিয়াছেন—অন্যদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক কেবল সূতাকাটিয়া দিন গুজরান করিত, তাহারা কাজের অভাবে অলস এবং উপার্জ্জনের অভাবে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। সূতার অভাবে তাঁতীর তাঁত কমিয়াছে—জীবন রক্ষার জন্য তাহাদের অনেকে এখন নানা ব্যবসায় ধরিয়াছে; এমন কি ঝাড়ুদারের কাজ পর্য্যন্ত করিতেছে! ব্যবসায়ের অভাবে শিল্প-নিপুণ তাঁতীদের সংখ্যার অর্দ্ধেক লোপ পাইয়াছে। যাহারা এখনো কাপড় বুনিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—তাহারাও হাতে কাটা সরু সূতার অভাবে—বিদেশ হইতে আমদানী করা সূক্ষ্ম সূতায় কাপড় বুনাইতেছে।

"কি উদ্দেশ্যে যে আমরা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে চাহিতেছি, বোধ হয়, এখন আপনারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। হিংসাবুদ্ধিতে আমরা এ কাজ করিতেছি না। গভর্ণমেণ্ট যদি আজই খেলাফতের ও পঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতীকার করেন এবং ভারতে স্বরাজ দেন, তাহা হইলেও এই বিদেশীবস্ত্র-বর্জ্জন-আন্দোলন চলিবেই। ভারতীয় জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার জন্য যেরূপ অর্থাগমের উপায় করা আবশ্যক, সে সকল উপায় বজায় রাখিবার জন্য—যে যে ভারতীয় শিল্পের রক্ষা আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা করিবার শক্তিটার নাম মোটামোটা "স্বরাজ" দেওয়া যায়। আবার ঐ সকল অর্থাগমের প্রতিকূল যে সকল আমদানী তাহা বন্ধ করিবার শক্তিকেও 'স্বরাজ' বলা যায়। কৃষি ও হাতে সূতা কাটা (অর্থাৎ ভাত ও কাপড়ের ব্যবস্থা) এই দুইটী জাতিরূপ দেহের দুইটী ফুস্‌ফুস্‌। সেই ফুস্‌ফুস্‌ দুইটীতে যাহাতে ক্ষয় রোগের আবির্ভাব হইতে না পারে, তাহার উপায় করাই আমাদের কর্ত্তব্য। * * * *

"মদ্যপান আন্দোলনও ঐরূপ তুল্য আবশ্যকীয়। দেশব্যাপী মদের দোকান খুলিয়া ভারতীয় সমাজের যে সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তাহা আর চালাইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। যাহা হউক, দেশের জনসাধারণ এক্ষণে এ বিষয়ে সবিশেষ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।"

মহাত্মা গান্ধী দেশের জনসাধারণের দরিদ্রতা দূর করিতে—ভাতকাপড়ের জন্য যাহাতে দেশের কোন লোককে বিদেশের মুখের দিকে চাহিতে না হয়—সেই ব্যবস্থা করিতেই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে দেশের প্রত্যেক লোক আপন পায়ে দাঁড়াইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে—কাহারও কাজের অভাব হইবে না অথবা কাজের জন্য ছুটাছুটি করিয়া এদেশে ওদেশে ঘুরিতে হইবে না। অনুষ্ঠান ছাড়া

শুধু কল্পনা কিংবা পরামর্শে কোনই কাজ সম্পন্ন করা যায় না। কাজ করিয়া ফল পাইতে হইলেই পরিশ্রম করিতে হয়—কষ্টস্বীকার করিতে হয়। আবার সেই কাজ যত গুরু বা গুরুতর হইবে—পরিশ্রম বা কষ্টও তত বেশী হইবে। সুতরাং মহাত্মাজীর যুক্তি অনুসারে বিদেশী কাপড় বর্জ্জন অসম্ভব বলিয়া যাঁহারা কথার জাল বুনিতেছেন, তাঁহাদের সে উক্তি সত্য নহে। তবে একটা বিপুলদেহ জাতির এত বড় একটা অভাব দূর করিতে হইলে কাজের যাঁহারা অনুষ্ঠানকারী তাঁহাদিগকে বিশেষ যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এদিকে আমাদের যুবরাজ—সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ আগামী শীত ঋতুতে ভারতবর্ষভ্রমণে আসিবেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। শুনা যায়, নবীন বড়লাট লর্ড রেডিং বাহাদুরই নাকি যুবরাজকে এদেশে আনিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী ইহার বিরোধী, তিনি উহা শুনিয়া বলিয়াছেন যে—যুবরাজ ত বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির গুণকীর্ত্তন করিতেই আসিবেন ? অথচ সেই শাসনের প্রবর্ত্তক সরকার (১) পঞ্জাবের অত্যাচারের জন্য দায়ী ; (২) মুসলমানদিগের কাছে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন ; (৩) ভারতবর্ষে জোর করিয়া মদের ব্যবসায় চালাইয়াছেন ; (৪) ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়াছেন ; (৫) ভারতবর্ষকে এমন ভাবে শক্তিহীন করিয়াছেন যে, তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া—দাস হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে করিতেছে। কাজেই এমন গভর্ণমেণ্টের প্রশংসার জন্য যিনি আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে ভারতবাসী স্বীকার করিবে না। বস্তুতঃ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ভারতবাসীর অনিচ্ছা অবহেলা করিয়া যুবরাজকে এদেশে আনয়ন করিলে—ডিউক অব্ কনট (যুবরাজের খুল্লপিতামহ) এদেশে আসিবার পর যেমন হরতাল হইয়াছিল—আবার তেমনি হরতাল হইবে।"

ইহার পর মহাত্মা গান্ধী পুণানগরে গমন করেন, সেখানে কেশরী আফিসে, কেশরীর নেতা পুরুষসিংহ লোকমান্য তিলকের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তদুপলক্ষে বিশহাজার লোকের সমবায়ে পুণায় আর একটা সভা হয়। মহাত্মা গান্ধী ঐ সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—"লোকমান্য তিলক মহারাজের ন্যায় কঠোর ক্লেশস্বীকার করিয়াও দেশহিতে রত হওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। বিদ্যালয় ও বিচারালয় বর্জ্জন বিষয়ে আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সফল হইয়াছে সুতরাং সে সম্বন্ধে এখন আর আমাদের তত মন দেওয়ার দরকার নাই। এক্ষণে হিন্দু মুসলমানে একতা, নিরুপদ্রব নীতির অনুসরণ ও বিদেশীবস্ত্রবর্জ্জন বিষয়ে আমি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বস্ত্রবর্জ্জন-আন্দোলন সফল হইলে সত্য সত্যই "স্বরাজ" লাভ হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে।" শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মৌলানা মহম্মদ আলীও মহাত্মাজীর সঙ্গী ছিলেন। এখান হইতে তাঁহারা আবার বোম্বাই চলিয়া যান।

দেখিতে দেখিতে ১লা আগষ্ট আসিল। মহাত্মাজীর আহ্বানে তথায় বিদেশীবর্জ্জনের উদ্যোগ হইল—প্রায় লক্ষ লোকের সমাগমপূর্ণ সভা হইল। এই সভায় অসংখ্য বিদেশী কাপড় সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করা হইল। সাময়িক পত্রে প্রচার যে, এই বস্ত্রযজ্ঞের কুণ্ডটীর পরিধি নাকি এক মাইল ব্যাপী হইয়াছিল!

এখান হইতে মহাত্মাজী ক্রমে পঞ্জাব, পঞ্জাব হইতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় তিনি কয়েক ঘণ্টামাত্র ছিলেন। সমস্ত দেশের সকল শ্রেণীর লোককে অনলস ও কার্য্যক্ষম এবং উপার্জ্জনপটু করিয়া তোলাই মহাত্মা গান্ধীর একমাত্র উদ্দেশ্য—সে উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন—লোকদিগকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

শুনা যায় এবার কলিকাতায় আসিয়া তিনি নাকি দেশী কাপড়

ব্যবহার বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"বাঙ্গালীকে শুধু বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিলেই চলিবে না—বাঙ্গালা দেশে যাহাতে প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে সেজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা শুধু বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াও যদি বঙ্গদেশবাসীরা কাপড়ের জন্য বোম্বে, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিই চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের উপকার হইল কি ?"

বাস্তব পক্ষেও বস্ত্রমূল্যের বাবদ ভারতবর্ষের বাহিরে টাকা চলিয়া যাইতে দেওয়া যেমন ভারতের পক্ষে ক্ষতি হয়, ভারতবাসীর দরিদ্রতা জন্মে—পক্ষান্তরে ভারতবাসীকে আলস্যে ডুবিয়া অকর্ম্মণ্য হইতে হয়—সেইরূপ কাপড়ের মূল্যের জন্য যদি বাঙ্গালা দেশ হইতেও তাহার বাহিরে টাকা চলিয়া যায়, তবে বঙ্গদেশবাসীর পক্ষেও ক্ষতি এবং তাহাদের দরিদ্রতা ঘটিবে; অধিকন্তু কর্ম্মের অভাবে বাঙ্গালীকে আলস্যে ডুবিয়া অকর্ম্মণ্য হইতে হইবে। কেবল বঙ্গদেশবাসী নহে—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশবাসীর পক্ষেই ঐ একই কথা—সকলকেই আত্মাবলম্বী হইতে হইবে। তাহা হইলেই—সেই ব্যক্তিগত আত্মাবলম্বনবল মিলিত হইয়া বত্রিশ কোটী লোকের বিপুল ক্ষমতায়—ভারতবর্ষ অসীমশক্তি, অজেয় আত্মরক্ষণ ক্ষমতা ও বিপুল কর্ম্মবলে বলীয়ান হইবে।

মহাত্মাজী কলিকাতা হইতে মৌলানা আজাদ সোবানি ও সস্ত্রীক মৌলানা মহম্মদ আলী সহ গৌহাটী যাত্রা করিয়া ১৮ই আগষ্ট অপরাহ্নে সেখানে পৌছেন। ষ্টেসন হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ মহাত্মাজীকে দলবলসহ গৃহে লইয়া যান। মফস্বলে স্বেচ্ছাসেবকগণের এমন বিরাট মিছিল আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মহাত্মাজী ও তাঁহার সঙ্গীদিগের উপদেশে রমণীরাও বিশেষ উৎসাহের সহিত স্বদেশী গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট

সত্যাগ্রহ

[সত্যাগ্রহ ব্যাপারটা কি, মহাত্মা গান্ধী তাহার যে বর্ণনা দিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল।]

ইংরেজী "প্যাসিভ্ রেজিষ্ট্যান্স্" বা "নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ" এই সকল সংজ্ঞাদ্বারা সত্যাগ্রহ ব্যাপারের স্বরূপ প্রকাশ পায় না। "সত্য-বল" এইরূপ সংজ্ঞা দিলে উহার স্বরূপ প্রকাশ পায়। সত্যবল আত্মারই বল, উহা বাহুবলের বিপরীত। উহা খাঁটি ধর্ম্মমূলক অস্ত্র। যাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নাই, তাঁহারাই শুধু সত্যবলের প্রয়োগ করিতে পারেন। প্রহ্লাদ, মীরাবাই প্রভৃতি এই অর্থে নিরুপদ্রব প্রতিরোধী বা সত্যবল-প্রয়োগকারী।

মরক্কোতে যে যুদ্ধ হয়, তখন ফরাসী সৈনিকেরা মরক্কোর আরবদিগের উপর কামান দাগিতেছিল। আরবদিগের মনে কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছে,—সুতরাং তাহারা মরণ অগ্রাহ্য করিয়া আল্লা আল্লা রবে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া কামানের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার তাহাদের আর গতিই ছিল না। এই অদ্ভুত আত্মত্যাগ দেখিয়া ফরাসী সৈনিকেরা কামানদাগা বন্ধ করিল—টুপী আকাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া আরবগণের দিকে ছুটিয়া গেল এবং আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের সহিত কোলাকুলি করিতে লাগিল! নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বা সত্যবল যে কিরূপে জয়লাভ করে, ইহাই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ যে কি, আরবেরা তাহা জানিত না—তাহারা সেই ব্রতও গ্রহণ করে নাই; কেবল সাময়িক উত্তেজনার বশে ধর্ম্মবুদ্ধি বশতঃ

তাহারা মরণকেই বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চারও ছিল না। কিন্তু যে প্রকৃত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী তাহার চিত্তে বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে না, সে ক্রোধের বশে মরণের মুখে অগ্রসর হয় না, পরন্তু পরের কৃত অত্যাচার সহিয়া লইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই, সে স্বেচ্ছাচারীর কাছে মাথা নোয়াইতে অনিচ্ছুক। কাজেই নিরুপদ্রব প্রতিরোধীর হৃদয়ে সাহস, ক্ষমা ও প্রেম থাকা প্রয়োজন।

ইমাম হুসেন অতি অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়াই কারবালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এজিদ যে আদেশ দিয়াছিল, তাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সে আদেশ মানিয়া লইতে স্বীকার পান নাই, অথচ তিনি জানিতেন যে, আদেশ পালন না করিলে সকলকেই জীবন দিতে হইবে। আবার তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ আদেশ পালন করিলে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব লোপ পাইবে। কাজেই তিনি জীবন দিতেই প্রস্তুত হইলেন। ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিতে রাজী হইলেন না। ইমাম হুসেন যে আদেশ অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া লওয়া অপেক্ষা, তিনি আদেশকারীর অস্ত্রে পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রের মরণ এবং দারুণ তৃষ্ণায় কল্পনাতীত কষ্টভোগ করাও শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

তরবারির বলে মুসলমান ধর্ম্মের উত্থান হয় নাই, মুসলমান সাধুগণের আত্মত্যাগই উহার উত্থানের মূল—ইহাই আমার বিশ্বাস। তরবারি চালনায় একটুমাত্রও বাহাদুরী নাই। যে তলোয়ার চালায়, সে যখন নিজের ভুল বুঝিতে পারে—তখনই তাহার পাপবোধ জন্মায় এবং এ ঘটনা হত্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। নিজের অপরাধের জন্য হত্যাকারী তখন অনুতাপ করিতে থাকে। অন্যদিকে, আঘাতের ফলে যে মরে, সে যদি বুদ্ধিদোষেও মরণের মুখে গিয়া থাকে, তথাপি এ ক্ষেত্রে সে বিজয়ী।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অহিংসার ধর্ম্ম। কাজেই সকল সময়ে সকল অবস্থায়ই ইহা পালনীয় ও কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে এমন ধর্ম্ম নাই যাহাতে হিংসাত্যাগের উপদেশ নাই। যাঁহারা হিংসার সমর্থন করে, তাঁহারাও হিংসা সম্বন্ধে অনেক নিয়ম ও বিধি স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কোন সীমা—গণ্ডী নাই। যিনি কষ্ট সহিতে সমর্থ, তিনি অনন্তকাল উহা চালাইতে পারেন। বলিতে গেলে, কষ্ট সহিতে না পারাই উহার সীমা বা গণ্ডী।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আইনসঙ্গত কি না এ প্রশ্নের উত্তর নিরুপদ্রবপ্রতিরোধী ছাড়া অন্যে বলিতে পারে না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধীর—কার্য্য আরম্ভ করিলে পর, তাহার সম্বন্ধে অন্য লোকের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। লোক সকল সন্তুষ্ট হইতেছে না বলিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধী তাহার কর্ত্তব্য ছাড়িতে পারেন না। পাটীগণিতে সূত্র যেমন বাঁধা, তেমনি বাঁধা সূত্রের উপর নিরুপদ্রব প্রতিরোধীর কার্য্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। লাভ ক্ষতির হিসাব করিয়া যিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আরম্ভ করেন, তিনি চতুর রাজনীতিক বটেন, কিন্তু কখনই প্রকৃত নিরুপদ্রব প্রতিরোধী নহেন।

স্মরণাতীত কালহইতে মনের বল ও বাহুবল এই দুইই প্রচলিত আছে। উভয়ের সম্বন্ধেই ধর্ম্মশাস্ত্রে সুখ্যাতি আছে। মনের বল সৎ এবং বাহুবল অসৎ শক্তির নির্দ্দেশ করে। ভারতীয়গণের বিশ্বাস যে এক সময়ে এ দেশে সৎশক্তির অর্থাৎ মনের বলেরই প্রাধান্য ছিল; আমাদের আদর্শও এখন পর্য্যন্ত তাহাই স্থির আছে। অসৎ শক্তির প্রাধান্যের পরিচয় ইউরোপ খণ্ডেই সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দুইয়ের যে কোনটা নীচ কাপুরুষতা অপেক্ষা ভাল। আমাদিগকে হয় মনের বল নতুবা বাহুর বল আশ্রয় করিতে হইবে, অন্যথা স্বরাজ লাভ হইবে না—জাতীয়

জাগরণ দেখা দিবে না। কোনরূপ কিছু না করিয়া যে স্বরাজ পাওয়া যায়, তাহা স্বরাজই নহে; উহা লোকের মনে কোন ধারণাই জন্মাইতে পারে না। স্বরাজের ক্ষমতা কি, দেশের জনসাধারণ যত দিন তাহা বুঝিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদের জাগরণ সম্ভব নহে। নেতারা যত কেন প্রতিবাদ না করুন, আর গভর্ণমেণ্ট যত কেন চেষ্টা না করুন, আগাছার মত বিনা যত্নে উৎপন্ন বিপ্লববাদ আপনা আপনিই মাথা তুলিবে—একমাত্র নিরুপদ্রব প্রতিরোধই উহা নিবারণের উপায়। ফসল জন্মাইতে হইলে জমিতে যেমন সার দিতে হয়, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কৃষি করিতে হইলেও তেমনি চেষ্টা ও সাহস নামক দুইটী সার ব্যবহার করিতেই হইবে। আর ফসল রক্ষার জন্য যেমন আগাছা তুলিয়া ফেলা আবশ্যক, সেইরূপ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ উৎপাদনের জন্য আত্মত্যাগ দ্বারা জমি পরিষ্কৃত ও ভালবাসা দ্বারা উহাতে পূর্ব্বে উৎপন্ন বিপ্লববাদের বীজ দূরীভূত করিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের অন্যায় ও অত্যাচারের কথা ভাবিয়া যাহারা চঞ্চল ও ক্রুদ্ধ, আমরা সেইরূপ যুবকদিগকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতির বলে ভুলপথহইতে সৎপথে আনিতে পারি। সেই সকল যুবকের বীরত্ব, সাহস ও সহিষ্ণুতাকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করিয়া আমরা সৎশক্তির বল বাড়াইতে পারি।

এই কারণেই বুঝা যাইতেছে যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের ভাব দেশের মধ্যে যত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে ততই মঙ্গল। ইহা দ্বারা রাজা প্রজা উভয়েরই কল্যাণ হইবে। গভর্ণমেণ্টই হউক বা অন্য যে কেহ হউক, কাহাকেও বিপদে ফেলা নিরুপদ্রব প্রতিরোধীর উদ্দেশ্য নহে। সে কাহারো সহিত উগ্র বা কঠোর ব্যবহার করে না—নির্ব্বোধের মত কাজ করে না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধী বয়কটের বিরোধী; কিন্তু স্বদেশীর

পক্ষপাতী। কেন না স্বদেশি-গ্রহণ তাহার ধর্ম্মগত ব্যাপার। কেহ স্বদেশী সাধনায় কথনো বিমুখ হয় না। সে শুধু ভগবানকেই ভয় করে, আর কাহারো ভয়েভীত হয় না—রাজশক্তির ভয়ে কর্ত্তব্য পথ ত্যাগ করে না।

অহিংস অসহযোগ

(Non-violent Non-co-operation.)

আজকাল সহকারিতাবর্জ্জন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, ইংরেজীর প্রকৃত অনুবাদ করিলে উহা "অহিংস-অসহযোগ" কিংবা "হিংসাহীন সহকারিতা-বর্জ্জন" লিখিলে সঙ্গত হয়।

১৯২০ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশন হইবার প্রস্তাব হয়। এই বিশেষ অধিবেশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল (১) পঞ্জাবের ব্যাপার, (২) খিলাফৎ প্রশ্ন, (৩) শাসন সংস্কার নিয়ম ও (৪) অহিংস-অসহযোগ বিষয়ের আলোচনা। জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশনের পূর্ব্বে—আগষ্ট মাসের ১২ই ও ১৮ই তারিখে মহাত্মা গান্ধী মান্দ্রাজে এবং ত্রিচিনাপল্লীর বক্তৃতায় অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করেন— আমরা নিম্নে তাহার স্থূল স্থূল মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

১। অহিংস-অসহযোগের আবশ্যকতা

অহিংস-অসহযোগ অবলম্বন করিবার জন্য আমরা সকলকে পরামর্শ দিতেছি কেন, তাহার প্রথম ও প্রধান উত্তর খেলাফৎ সমস্যা। খেলাফতের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদিগের হৃদয়ে গভীর বেদনার

সৃষ্টি হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংরেজ জাতির নামে যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, সে ঘোষণা আজ ধূলায় লুটাইতেছে। খেলাফৎ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া বৃটিশ জাতি নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় মুসলমান আজ বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ জাতি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে, ইংরেজ রাজসরকারের প্রতি রাজভক্তি অটল রাখা মুসলমানগণের পক্ষে সম্ভব নহে। মোসলেমগণ রাজভক্তির চেয়ে ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তাই তাঁহারা স্পষ্ট কথায় জগৎসমক্ষে বলিতেছেন যে, বৃটিশজাতি তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে, তাহারা রাজার প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না। মুসলমানগণ হিন্দুর প্রতিবেশী ও একই জন্মভূমির সন্তান। বৃটিশ জাতি অপেক্ষা মুসলমানই তাহাদের অধিকতর আপন। সুতরাং এই খেলাফৎ ব্যাপারে মুসলমান-গণের পক্ষাবলম্বন করাই হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্য। হিন্দু ও মুসলমান প্রাণপাত করিয়াও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইবে। ইহাই খিলাফৎ। ইহা ছাড়া পঞ্জাবের অত্যাচার ও রাউলাট আইন আছে। বিলাতী বা ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কোন মতেই ভারতীয়দিগের মর্ম্মান্তিক এই সকল ব্যাপারের সংশোধনে রাজি নহেন—ভারতবাসীর প্রতি ন্যায় বিচার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই ভারতবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া 'অহিংস-অসহযোগ' নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছে।

২। অহিংস-অসহযোগ আইনবিরুদ্ধ কি আইনসঙ্গত ?

অহিংস-অসহযোগনীতি আইন বিরুদ্ধতো নহেই, অধিকন্তু ইহা সম্পূর্ণ ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত। মানুষ মাত্রেরই ইহা জন্মগত অধিকার ও সম্পূর্ণ

আইন সঙ্গত ব্যাপার। বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন গোঁড়া ভক্ত বলিয়াছেন যে, 'বিদ্রোহও যদি সফল ও সার্থক হয়, তবে বৃটিশ রাজনীতি অনুসারে তাহাও বৈধ।' ইতিহাস হইতে নানা উদাহরণ দিয়া, ইনি নিজের কথার সত্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। যে বিদ্রোহ বাহুবলের উপর নির্ভর করে, আমি কখনো তাহাকে বৈধ বলিতে পারি না। ইউরোপেই ঐরূপ বিদ্রোহদ্বারা ফল ফলিতে পারে—ভারতবর্ষে নহে। * * * ভারতের স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান। ঋষিরা যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতাবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ভিত্তি পশুবলের উপর স্থাপিত হইতে পারে না—আত্মোৎসর্গই উহার প্রকৃত ভিত্তি, যজ্ঞ এবং কোরবাণীর উপরই উহা সংস্থাপিত। আমি তাহারই অনুসরণ করি এবং আজীবন করিব। যিনি শত্রুর তরবারির মুখে বুক পাতিয়া দিয়া অনায়াসে মরণকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, আমার মতে তিনিই বীর—ইহাই অসহযোগনীতির মূল ও শান্তিময় পথ। যতদিন উহা অহিংস বা দাঙ্গাহাঙ্গামাশূন্য থাকিবে, ততদিন উহাকে কেহই আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

আমি যদি গভর্ণমেণ্টকে বলি যে, "আমি আর গোলামী করিব না" তাহা কি আইন বিরুদ্ধ? সভাপতি মহাশয় যদি সরকারী উপাধিপত্র সকল সরকারকে ফিরাইয়া দেন, তাহা কি বে-আইনী হইবে? বাপ মা অথবা অভিভাবকেরা যদি সরকারী স্কুল হইতে ছেলেদের উঠাইয়া লন বা তথায় পড়িতে না পাঠান, তবে উহা কি আইন বিরুদ্ধ বলিবে? কোনও আইন-ব্যবসায়ী যদি বলেন যে, "যে আইনদ্বারা আমাদের উন্নতি না ঘটিয়া অবনতিই ঘটিতেছে, আমি সেই আইন সমর্থন করিব না" ইহা কি বে-আইনী হইবে? কোন সরকারী কর্ম্মচারী (কেরাণী বা বিচারক) যদি বলে যে, "যে সরকার দেশের লোকের কথায় আদৌ কাণ দেন না, আমি তাঁহার অধীনে কাজ করিতে পারিব না, তবে উহা কি বে-আইনী

হইবে? সরকার দেশের স্বার্থ হানি করিতেছেন বা দেশবাসীর প্রতি অত্যাচার করিতেছেন মনে করিয়া যদি কোনও পুলিশ বা সৈনিক কাজ ছাড়িতে চাহে, তাহা কি আইন বিরুদ্ধ হইবে? আমি যদি প্রজাদিগকে বলি যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট হইতে খাজানা লইয়া আমাদের কোন উন্নতির জন্য তাহা ব্যয় করিতেছেন না, সুতরাং আর খাজানা দেওয়া উচিত নহে—তবে উহা কি আইন বিরুদ্ধ হইবে? আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, ইহার একটাও আইনবিরুদ্ধ বা অসঙ্গত নহে। আমি ঐ সকল কাজ করিয়া দেখিয়াছি, কেহই উহা বে-আইনী বলেন নাই। খয়রার ব্যাপারে সকলেই আমাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অহিংস-অসহযোগ সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ-ভাব-বর্জ্জিত, উহাতে বিন্দুমাত্র বে-আইনী ভাব নাই।

ভারতবাসীরাই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিয়াছে। আবার সেই সরকারের ফলেই তাহারা এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে—তাহারা নাকে খত দিতে বা বুকে হাঁটিতে বাধ্য হইয়াছে—আমি সাহসের সহিত বলিতেছি যে, এরূপ গভর্ণমেণ্টই বে-আইনী এবং প্রজার পক্ষে এরূপ অপমান সহিয়া লওয়াই বে-আইনী। ভারতের সাতকোটী মুসলমান যদি নীরবে তাহাদের ধর্ম্মের গ্লানি সহ্য করে তবে তাহাই বে-আইনী। অন্যায়পূর্ব্বক পঞ্জাবের তাদৃশ সম্মান-হানির পরও দেশবাসীর পক্ষে সরকারের সহিত সহযোগিতা করা বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সম্পূর্ণ বে-আইনী। আমি আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতা-দিগকে বলিতেছি যে—"যতদিন তাহাদের মনে আত্মসম্মান বোধ থাকিবে—যতদিন তাহারা সনাতন রীতিনীতির প্রণেতা ও রক্ষকের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবেন—ততদিন তাহাদিগের পক্ষে অহিংস-অসহযোগ গ্রহণ না করাই অবৈধ এবং বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করাই বে-আইনী।"

আমি ইংরেজ বা বৃটিশজাতি অথবা যে কোনও গভর্ণমেণ্টের বিদ্বেষী

নহি। আমি অসত্যের শত্রু—অবিচারের বিরোধী। গভর্ণমেণ্ট যতকাল অবিচার অত্যাচার করিবেন—ততদিন আপনারা আমাকে তাহার ঘোরতর শত্রু বলিয়া মনে রাখিতে পারেন। * * * *। আমাদের শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের মতানুসরণ করিয়া বলিতেছি যে, অবিচার ও বিচার, অবিচারী ও বিচারপ্রিয়ব্যক্তি, সত্য ও মিথ্যা পরস্পর বিপরীত—বিরোধী, উহাদের মধ্যে কোন প্রকার সহযোগিতা থাকিতেই পারে না। গভর্ণমেণ্ট যখনই আমাদের সম্মানের হানি করিবেন, তখনি তাহাদের সহিত অসহযোগিতা করিতেই হইবে। ইহাই অসহযোগ নীতি।

৩। ব্যবস্থাপকসভা ত্যাগ

অহিংস-অসহযোগ অবলম্বনকারীকে সকলের আগে বর্জ্জন করিতে হইবে ব্যবস্থাপকসভা। কেননা আমরা ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধি, জনসাধারণকে প্রশস্ততর পথে পরিচালিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তেমন ক্ষেত্রে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ কখনো উচিত নহে। কেহ কেহ বলেন যে, আগে সংস্কৃত ব্যবস্থাপকসভায় প্রবেশ করা যাউক, তারপর সরকারের বিরুদ্ধবাদিতা করিব। এরূপ ব্যাপার কুটিলতা, দেশনায়কের পক্ষে ইহা কদাপি করণীয় নহে—যদি কেহ এইরূপ ব্যবহার করেন, তবে জনসাধারণ তাহাকে কখনো বিশ্বাস করিবে না। আর উহাতে দেশের কোন লাভও হইবে না। আমার মতে যাহারা ভারতের উপর অবিচার অত্যাচার করিবে—যতদিন না তাহারা সেই অবিচার অত্যাচারের প্রতিবিধান না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে কোনপ্রকার দানই গ্রহণ করা উচিত নহে।

গ্রীক্‌দের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে 'গ্রীক্‌দিগকে বিশ্বাস করিও না—বিশেষতঃ তাহারা যখন কোন পুরস্কার দিতে আসিবে।

এক্ষেত্রেও তাহাই—ইস্‌লাম ও পঞ্জাবের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান করিয়া বৃটিশ মন্ত্রীরা আমাদিগকে যে সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভা দিতে চাহিতেছেন, আমরা কোন মতেই তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। অধিকন্তু তাহারা যাহাতে এই প্রলোভনের জালে আমাদিগকে আট্‌কাইতে না পারে, সেজন্য বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই কারণেই ঐ আইন-সভা বর্জ্জন করা উচিত। যাহারা উহাতে প্রবেশ করিয়া শেষে নিজমূর্ত্তি ধরিবেন মনে করিতেছেন—উহাতে প্রবেশ করিলেই তাহাদিগকে ফাঁদে পড়িতে হইবেই হইবে।

৪। আইনব্যবসায়ীর সহযোগিতা বর্জ্জন

আইন-ব্যবসায়ীদিগের সহায়তায়ই গভর্ণমেণ্ট নিজের ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছেন। অথচ ইঁহারাই দেশের নায়ক—দেশের কল্যাণকামনায় সচেষ্ট। যখন গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ করিতে হইবে—তাহাকে অচল করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে—তখন আইন ব্যবসায়ীরা বিরুদ্ধবাদী হইলেও গভর্ণমেণ্ট নিজের শক্তি ও মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য এই আইন ব্যবসায়ীদিগকেই ডাকিবেন। তাঁহারা যখন মাহিয়ানার কর্ম্মচারী নহেন, তখন অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাঁহারা আর বিনা মাইনার চাকররূপে কঠোর আইন কানুনের বন্ধনে আটক থাকিতে পারিবেন না। অসহযোগীরা আইনব্যবসায় করিতে পারিবেন না সত্য, কিন্তু আমরা সালিসী আদালত প্রতিষ্ঠায় নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া এই সকল অসহযোগী আইনজ্ঞদিগের দ্বারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিব—সাদাসিদে, খাঁটি সহজ বিচারে দেশ-বাসীর বিচারাভাব দূর করিব। ইহারই নাম আইন ব্যবসায়ীর অসহযোগ।

৫। অভিভাবকগণের অসহযোগ

* * * * গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগই যখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন তাহার স্থাপিত বা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সহিতও অসহযোগ করিতে হইবে। যাহাকে আমি সাহায্য করিব না, তাহার কাছ হইতে সাহায্যও লইব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সরকারী স্কুল কলেজ গুলি সরকারী গোলাম ও কেরাণী তৈয়ার করিবার কারখানা মাত্র। কাজেই আমাদের সন্তানগুলিকে কখনই এই সকল স্কুল কলেজে পাঠাইতে পারি না।

৬। উপাধিধারীর কর্ত্তব্য

যখন আমরা বিশ্বাস করিতাম—গভর্ণমেণ্ট আমাদের জাতীয় সম্মান কখনো ক্ষুণ্ণ করিবেন না, তখন গভর্ণমেণ্টের দেওয়া উপাধিগুলি সম্মানের চিহ্ন ছিল। তারপর সরকারের নিকট সুবিচারের আশা যখন বৃথা বলিয়া বুঝিলাম, তখন আর তাহাদের দেওয়া উপাধি কিছুতেই সম্মানের চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—বরং উহা অসম্মান-সূচক, অপমান-জনক। কাজেই অবিলম্বে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

উপাধিধারীরা যদি তাঁহাদের উপাধি ত্যাগ না করেন, তবে তাঁহারা কোন রূপেই অসহযোগের কৃতকার্য্য হইবেন না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সময় জনসাধারণ যেমন নেতাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই শাসনকার্য্য চালাইয়াছিল—জয়পতাকা উড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছিল, আমাদের দেশের জনসাধারণও যদি সেইরূপ শিক্ষিত বাবুর দলকে বর্জ্জন করিয়া অসহযোগে অগ্রসর হয়, তবে নিশ্চিতই উহা সফল হইবে। আমি বিপ্লব চাই না, চাই শান্তি। বর্ত্তমানে দেশমধ্যে শান্তির নামে যে দারুণ অশান্তি বিরাজ করিতেছে, আমি সেই ছদ্মশান্তির স্থলে প্রকৃত শান্তির

প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, অবিচারের স্থলে বিচারের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাই। তাই সকলকে অসহযোগনীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছি।

এই অহিংস-অসহযোগ যে কি পদার্থ, তাহা যদি আপনারা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন যে, আপনার বধের জন্য যখন তরবারি উদ্যত হইবে, আপনার পক্ষে তখন একটী কঠিন কথা বলিবারও আবশ্যক হইবে না। তরবারির বদলে তরবারী বা যষ্টির কথাত দূরে থাকুক, অহিংস-অসহযোগের এমন মহিমা যে, তদবলম্বনকারীকে আত্মরক্ষার জন্য কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটী পর্য্যন্ত তুলিতে হয় না।

৭। বিলাতী পণ্য বর্জ্জন

সর্ব্বপ্রকারে বিদেশী সামগ্রার ব্যবহার ত্যাগ করণ আর স্বদেশীর গ্রহণ একই কথা। কিন্তু সহসা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন সম্ভব নহে, উহাতে দেশের ধনশালী বণিকগণ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কাজেই উহা ধীরে ধীরে করিতে হইবে। পবিত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়াই আমরা বিলাতী বর্জ্জন করিতেছি—কাহারো শাস্তির জন্য নহে; পরন্ত ইহা ত্যাগস্বীকার মন্ত্র।